পিওতর মান্তেইফেল

প্রকৃতিবিদের কাহিনী

প্রফেসর প. মান্তেইফেল

প্রকৃতিবিদের কাহিনী

প্রগতি প্রকাশন · মস্কো

মূল রুশ থেকে অনুবাদ: ননী ভৌমিক
অঙ্গসজ্জা: ন. রাদিওনভ

Профессор **П. Мантейфель**
«РАССКАЗЫ НАТУРАЛИСТА»
На языке бенгали

М $\frac{70803-537}{014(01)-74}$ 596—74

সূচি

ভূমিকা

প্রকৃতিকে ভালোবাসা যায় নানা ধরনে।

ভালোবাসা যায়, কেননা ওটা রেওয়াজ, অরণ্যের শোভা, পাখির কাকলি কোনোটাতেই মুগ্ধ না হয়ে বলা যায় 'দ্যাখো, দ্যাখো, কী সুন্দর'। এটা ভালোবাসা নয়।

ভালোবাসা যায় শিল্পীর মতো, তার গহন রহস্য উদ্ঘাটনের অসীম কৌতূহল নিয়ে।

শেষত ভালোবাসা যায় এমনভাবে যাতে প্রকৃতির রূপে মুগ্ধ হয়েও, কৌতূহলী হয়েও তাকে চালনা করা হচ্ছে, তাকে পুনর্গঠিত করে বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে তার সম্পদ। এ বইয়ের লেখক প্রফেসর পিওতর আলেক্সান্দ্রভিচ মান্তেইফেল (১৮৮৩—১৯৬০)-এর প্রকৃতিপ্রেম ছিল ঠিক এই রকম।

ছোটো থাকতেই ওঁর সঙ্গে বনে যাবার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। মনে হত, ওঁর যেন সাধারণ লোকের মতো পাঁচটা নয়, আছে অনেক বেশি ইন্দ্রিয়। দীর্ঘদেহী, বৃষস্কন্ধ মানুষ তিনি, বন দিয়ে যখন যেতেন তখন তাঁর ছাত্রদের নবীন চোখেও যা ধরা পড়ত না, তা তিনি দেখতে পেতেন তাঁর শ্যেনচক্ষুতে। প্রত্যেকটি খসখস, প্রত্যেকটি শনশন কানে যেত তাঁর, সমস্ত পরিপার্শ্বকে তিনি যেন নিজের মধ্যে টেনে নিতেন। হাঁটতেন তিনি শব্দ না করে, বড়ো বড়ো পা ফেলে, শিস দিতেন পাখিদের উদ্দেশে, তারাও সাড়া দিত।

তবে সবচেয়ে স্মরণীয়টা ঘটে পরে। প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা করতেন তিনি, সিদ্ধান্ত টানতেন এবং শেষে ব্যাপক সাধারণীকরণে পৌঁছতেন।

অনুধ্যান, পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা — এই ছিল তাঁর ধ্বনি। আর 'প্রকৃতিবিদের কাহিনী'র সব গল্পেই পরিষ্কার দেখা যাবে তাঁর অনুসন্ধানের এই রীতি। নেহাৎ 'শিকার-কাহিনী' নয়, বড়ো একজন বৈজ্ঞানিকের বলা গল্প এগুলি। জন্তু-জানোয়ারের জীবন সম্পর্কে চিত্তাকর্ষক খবরই তিনি দেন না, পাঠকদের নিয়ে যান সুনির্দিষ্ট এক-একটা সিদ্ধান্তে। এ রকম গল্প তাঁর আছে অনেক, এখানে শুধু তার একাংশই সংকলিত।

তাঁর ৭৭ বছরের গোটা জীবনটাই (বিশ্বযুদ্ধ ও ১৯২১—১৯২২ সালে লাল ফৌজে থাকার সময়টা বাদে) ছিল বিজ্ঞানের জন্যে উৎসর্গিত। সারা দেশটা চষে

বেড়িয়েছেন মান্তেইফেল। উত্তর ইয়াকুতিয়া থেকে দক্ষিণ উজবেকিস্তান, সাইবেরিয়া থেকে কাজাখস্তান, কত জায়গায় যে তিনি গেছেন, তার তালিকা দেওয়া অসম্ভব।

মান্তেইফেলের বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপ শুরু হয় অনেক আগে থেকেই। উইলিয়মস এবং রুশ পক্ষিবিদ মেঞ্জবির-এর মতো খ্যাতনামা বিজ্ঞানীদের ছাত্র তিনি।

মান্তেইফেলের কাজ আছে প্রচুর, তার অনেকগুলিই ব্যাপক খ্যাতিলাভ করেছে। সেবল বা মেরু-নকুলের কৃত্রিম সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটান তিনি, খরগোস ও মার্টিনদের সমাজজীবন নিয়ে অনুসন্ধান করে দামী ফারওয়ালা জন্তুদের ভিন্ন আবহাওয়ায় অভ্যস্ত করা নিয়ে দুঃসাহসী পরীক্ষা চালান।

তাঁর এসব পরীক্ষার ক্ষেত্র ছিল চিড়িয়াখানা (১৪ বছর ধরে তিনি এখানকার বৈজ্ঞানিক কাজের পরিচালক ছিলেন), অভিযান এবং শেষত সোভিয়েত ইউনিয়নের বহু সংরক্ষিত জীবাঞ্চল।

নিজের কাজে মান্তেইফেল বরাবর প্রাণীকে দেখেছেন তার পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে, বিশ্লেষণ করেছেন উদ্ভিদ, প্রাণী ও মৃত্তিকার প্রকৃতি, কেননা কেবল এইভাবে কোনো একটা জীব সম্পর্কে সত্যকার জ্ঞান হয়।

পিওতর আলেক্সান্দ্রভিচ মান্তেইফেলের কথা বলতে হলে তরুণদের শিক্ষাগুরু হিশেবে তাঁর উল্লেখ না করে পারা যায় না। বহু শিক্ষায়তনে তিনি পড়িয়েছেন, তাঁর ছাত্রদের অনেকেই আজ বিজ্ঞানী, বাল্যকালেই তাঁরা যাত্রা শুরু করেছিলেন চিড়িয়াখানায় মান্তেইফেল প্রতিষ্ঠিত কিশোর জীববিদদের চক্র থেকে।

ফার ইনস্টিটিউটে যতদিন তিনি পড়িয়েছেন তার ভেতর সহস্রাধিক শিকারবিদ ও পশুবিদ গড়ে দিয়েছেন তিনি। এখানে সদ্য-উদিত বিজ্ঞান সিস্টেমেটিক্স্ ও জীব-টেকনোলজি বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। তরুণদের তিনি শুধু জীববিদ্যা ও তাঁর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি শেখাতেন না। তিনি তাদের শিখিয়েছেন দেশপ্রেম, অধ্যবসায়, পর্যবেক্ষণের যাথার্থ্য, বন্ধুত্ব ও সাথীত্ব, পৌরুষ আর সহ্যশক্তি।

এ বইয়ের লেখক ছিলেন তেমনি মানুষ। বড়ো দরের বিজ্ঞানী, বৃহৎ তাঁর হৃদয়।

ইয়ে. উস্পেনস্কায়া

চিত্তাকর্ষক জীবন

তাইগায়

মস্কো চিড়িয়াখানার তিনজন তরুণ জীববিদের সঙ্গে সাইবেরিয়া ভ্রমণকালে একবার পেঁছিই ইয়েনিসেই নদীর দক্ষিণ উপনদী কান-এর তীরে।

আমরা প্রথমে নৌকো করে যাই, তারপর দিগন্ত-জোড়া মাঠ দিয়ে হাঁটি, শেষে পেঁছিই পাহাড়ে খাদে, আগেকার শান্ত চওড়া কান তখন তার মাঝখানে দিয়ে ছুটছিল উদ্দাম বেগে। পাহাড়ে আমাদের আগ্রহ ছিল ছোটো ছোটো এক ধরনের তীক্ষ্ণ-দন্ত প্রাণী নিয়ে — এদের বলা হয় 'আলতাই পিশ্চুখা', কিংবা 'সেনোস্তাভ্‌কা', বা বিচালি-বানিয়ে। আকারে তা ধেড়ে ইঁদুরের চেয়ে বড়ো নয়, তবে জাতে বরং খরগোসের কাছাকাছি। এদেরও একইরকম রোমশ থাবা এবং ওপরকার সামনের কর্তনদন্ত দুই সারিতে। শুধু কানগুলো লম্বা নয়, আর লেজ নেই একেবারেই।

শরতে কান-নদীর কাছাকাছি পাহাড়ে আমরা সেনোস্তাভ্‌কাদের পুরো একটা উপনিবেশ আবিষ্কার করলাম — শীতের জন্যে বিচালি তৈরি করছিল তারা। ঘাসের শীস বা ঝোপঝাড়ের ডাল দাঁত দিয়ে কেটে রোদে শুকাবার জন্যে সযত্নে তা বিছিয়ে রাখছিল পাথরগুলোর মাঝে তাদের বিবরের সামনে। তৈরি বিচালি তারা নিয়ে যাচ্ছিল একটা আধা-ঝুলন্ত পাথরের তলে এবং ঠেসে সেখানে বোঝাই করছিল।

শীতের জন্যে সেনোস্তাভ্‌কারা যে খাদ্য জমাচ্ছিল সেটা আমরা দেখলাম। আশ্চর্য তা রকমারি, আর পুষ্টির দিক থেকে দামী। পাথরের নিচে বিচালি গাদাটায় ছিল প্রোটিন-সমৃদ্ধ বরবটিজাতীয় শস্য এবং আরো এমন নানা উদ্ভিদ যাতে ভিটামিন,

স্নেহপদার্থ, কার্বো-হাইড্রেট ও ভেষজদ্রব্য — কিছুরই অভাব হবে না এই উদ্যোগী প্রাণীগুলোর।

হঠাৎ শারদীয় মেঘ এসে বৃষ্টি পড়তে শুরু করতেই এদের মধ্যে কী রকম হুলস্থুল পড়ে গেল, দেখতে বেশ মজা লাগছিল। তাড়াতাড়ি করে আধ-শুকনো ডাঁটিগুলো মুখে নিয়ে তারা তা লুকিয়ে রাখলে কোনো একটা আড়ালে। মনে হবে ছোট্ট এই মেহনতীরা বুঝি চিন্তা করতে পারে। তবে ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। এ হল বাইরের উত্তেজনায় জন্মগত রিফ্লেক্স বা প্রতিবর্ত ক্রিয়া।

শীতের জন্যে খাদ্য নষ্ট হয় বৃষ্টিতে। অস্তিত্বের কঠোর সংগ্রামের বহু হাজার বছর ধরে সে বৃষ্টি সেনোস্তাভ্‌কাদের কাছে হয়ে দাঁড়িয়েছে সর্বনাশের একটা সংকেত। সেটা তাদের তরফ থেকে প্রাণধারণের পক্ষে হিতকর একটা কর্মপ্রেরণা জাগায়; যথা, মাটিতে বৃষ্টি পড়লে খাবার লুকিয়ে রাখতে হয়। যেসব প্রাণী তা করে নি, তারা শীতে খিদেয় ভুগেছে, মারা গেছে অনেকে। যারা সবচেয়ে বেশি খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে, টিকে থেকেছে কেবল তারাই।

তাইগায়, অর্থাৎ উত্তরের ঘন অরণ্য এলাকায় আমাদের সঙ্গে দেখা করে বুড়ো জেলে মাত্‌ভেই গ্রিগোরিয়েভিচ গলোভ্‌কভ — চমৎকার শিকারী, চিন্তাশীল প্রকৃতিবিদ। আমাদের বললে যে শীতে যখন খুব গভীর হয়ে বরফ পড়ে, তখন সেনোস্তাভ্‌কাদের বসতিতে এসে হামলা করে মারাল হরিণ আর পাহাড়ী আরখার ভেড়া। আধঝুলন্ত পাথরের তলে জমানো, তুষার পাত থেকে রক্ষিত বিচালিগুলো তারা খেয়ে ফেলে, বেচারি জীবগুলোকে উপোস দিতে হয়। সেবল বা এরমিনজাতীয় নেউলেরাও থাকে সেনোস্তাভ্‌কাদের এলাকাতেই, কিন্তু ক্ষতি করে অনেক কম, শুধু শিকারের উত্তেজনায় শিকার করে না; পেট ভরা থাকলে শান্তভাবে চলে যায়, ছোঁয় না এই দন্তুরদের। তাছাড়া একই শিকার ক্ষেত্রে পরস্পরকে সইতে পারে না এরা। সেবলরা যদি এখানে ডেরা পাতে, তাহলে এরমিন বা কলিনস্কি কেউ আসবে না, কেননা সেবল তাড়া করে তাদের। কলিনস্কি যদি আসে, তাহলে ক্ষিপ্র আর ধূর্ত এরমিনদের তাড়িয়ে দেয় তারা। আর এই এরমিনরাই হল সেনোস্তাভ্‌কাদের পক্ষে সবচেয়ে বিপজ্জনক; যেসব গর্তে সেনোস্তাভ্‌কারা থাকতে পারে সেসব জায়গায় ঢোকে তারা। জেলেটি খুব নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে, প্রকৃতিকে জানে ভালো। বললে, একবার একটা জুনিপার ঝোপে সে দেখেছিল বাদামী পেঁচা, তার দিকে তাকিয়ে আছে। মাত্‌ভেই গ্রিগোরিয়েভিচ সন্তর্পণে ঝোপটা

ঘুরে যায়। পেঁচাটাও তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে মাথাটা ঘোরায় প্রায় পুরো এক চক্রেরও বেশি। বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলে: 'এসব পাখির গলায় হাড় আছে, নাকি মাথাটা ঘোরে কেবল চামড়ার ওপর? পেঁচাটা যখন উড়তে উড়তে মাথা ঘোরাতে লাগল, তখন গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগল না কেন?'

আমি বললাম, এমনিতেই পাখিদের গলা খুব নমনীয়, পেঁচাদের বিশেষ করে। আমার কৌতূহলী সহালাপীকে বোঝালাম যে মানুষের বা অন্য স্তন্যপায়ীদের মতো দুটি নয়, একটি কন্দ জয়েণ্টে পাখিদের মাথা থাকে গলার সঙ্গে জোড়া। তাছাড়া পাখিদের গলার এক-একটা অস্থিগ্রন্থি খুবই মুচড়ে যেতে পারে।

বৃদ্ধ আমাদের একটা পাহাড় দেখালে, আমাদের আসার কিছু আগে এখানে লড়াই বেধেছিল দুই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাদামী ভালুকের মধ্যে। সে বললে, যাকে নিয়ে লড়াইটা সেই ভল্লুকী শান্তভাবে বসেছিল দূরে, ওদের দিকে ভ্রূক্ষেপও করছিল না। দুই দৈত্যের গর্জন, রোমশ দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর পারস্পরিক আঘাত — কিছুই যেন নজরে পড়ছিল না তার। খুব একটা মোক্ষম চাপড় খেয়ে অপেক্ষাকৃত কমজোরীটা খাদের নিচে পড়ে যায়। পাহাড়ের খাড়াই গা বেয়ে অনেকখন ধরে গড়ায় সে, একগাদা পাথর খসে পড়ে তার সঙ্গে। পাহাড়ের কানা থেকে বিজয়ী লক্ষ্য করছিল তাকে। নিচে পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বী খাড়া হয়ে করুণভাবে তাকায় ওপরে। তারপর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে টলতে টলতে পালায়।

জিজ্ঞেস করলাম, 'গর্জন করছিল খুব জোরে?'

পাছে উত্তরটা সঠিক না হয় এই আশঙ্কায় খানিকটা ভেবে শিকারী বললে:

'তা বেশ জোরেই।'

কান-নদীর তীর থেকে অল্প দূরে ঢালুর চুড়োয় ছিল তার ছাউনি। এখানে একটা অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎকার ঘটে তার, শিগ্‌গির সেটা সে ভুলবে না। ছাউনিতে ঢোকায় মুখে ধুনি জ্বলছিল, সেটা ঠিক করার জন্যে বৃদ্ধ বেরিয়ে আসে রাত্রে। কাঠ ছিল কম, কাঠ কুড়োবার জন্যে বনে যায় সে। একগাদা কাঠ নিয়ে ফেরার সময় অন্ধকারে অনুচ্চ ফার বন থেকে বেরিয়ে আসে একটা কালচে মূর্তি। 'নিশ্চয় এল্‌ক্‌ হরিণ,' ভেবে মাত্‌ভেই গ্রিগোরিয়েভিচ ভালো মনেই হুমকি দেয় অনাহূত অতিথিকে। অমনি জন্তুটা তার সামনের দুই থাবা দিয়ে চেপে ধরে বুড়োকে। মস্তো একটা ভালুক সেটা। ভাগ্যি ভালো যে শিকারীর হাতে ছিল গাদাখানেক কাঠ, নইলে অমন আলিঙ্গন থেকে তাকে বাঁচতে হত না।

প্রথম ধাক্কাতেই ভারসাম্য হারিয়ে মানুষ আর জন্তু — দুজনেই ঢালু বেয়ে গড়িয়ে গিয়ে পড়ে নদীর খর স্রোতে। কেবল জলের তলে গিয়েই ভালুক তার শিকারকে ছেড়ে দেয় এবং মুহূর্তের মধ্যেই সে ভেসে যায় দূরে। শিকারী জলের তলের একটা খোঁটা আঁকড়ে সাবধানে নাকটা বাড়িয়ে দেয় জলের ওপর। তিন-চার মিটার স্রোতে ভেসে গিয়ে ভালুকটাও একটা পাথর চেপে ধরে। জলের ওপর দেখা গেল তার মাথা আর ঘাড়। চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলে ভালুক — মানুষটা ভেসে উঠছে নাকি? তারপর ধীরে ধীরে সে তীরে ওঠে; লোম থেকে অঝোরে জল গড়াচ্ছিল। পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সে চারিদিকে নাক ঘোরায়, শব্দ করে নিঃশ্বাস টানে, কিন্তু মানুষের গন্ধ টের পায় না। ওপরে উঠে ভালুক শিকারীর পুরনো পথচিহ্ন ধরে বনে ঢোকে।

ঝোপে সে অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত শিকারী মিনিট দুয়েক সবুর ক'রে সন্তর্পণে গিয়ে ওঠে তার ছাউনিতে। বন্দুকটা নিয়ে সে আলোকিত সুবিধামতো একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে লড়াইয়ে ডাকতে থাকে ভালুকটাকে, চুটিয়ে তাকে গালাগালি দেয়।

'কিন্তু কী সেয়ানা, হতভাগা জানোয়ারটা!' উপসংহারে বললে মাত্‌ভেই গ্রিগোরিয়েভিচ। 'কিছুতেই এল না শালা। ওদিকে, অন্ধকারে ঝোপের আড়াল থেকে হামলা — ওটা কি একটা কথা হল?'

ঘটনাটায় আমার তরুণ সহযাত্রীরা আকৃষ্ট হল। বললাম, সব ভালুকই যে মানুষকে আক্রমণ করে, তা মোটেই নয়। বরং ও রকম ভালুক দেখা যায় খুবই কম। সাধারণত ভালুকেরা খুব সতর্ক, মানুষ দেখলে অলক্ষ্যে লুকিয়ে পড়ার চেষ্টা করে।

নদী বরাবর এগিয়ে যাবার সময় আমরা তীরে প্রায়ই দেখেছি স্টেরলেট মাছের মাথা। এগুলো হল ভোঁদড়ের খাদ্যের অবশেষ। এ জন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের বহু অংশেই খুব কম দেখা যায়, শিকারীরা মেরে ফেলেছে।

আমাদের মৎস্যশিকারীটির কাছে ভোঁদড় খুবই আদরণীয়, প্রায় তার সহযোগী। ব্যাপারটা হল এই — শীতে স্টেরলেটরা গভীর গর্তের মধ্যে ঢুকে ঝাঁক বেঁধে থাকে। ভোঁদড় চট করেই স্টেরলেটদের এই সব ডেরা বার করতে পারে। তীরে ঝোপঝাড়ের কাছে সাময়িক গর্ত খোঁড়ে সে। ভোঁদড়ের চিহ্ন ধরে মাত্‌ভেই গ্রিগোরিয়েভিচ নির্ভুল-ভাবে টের পায় ঠিক কোন জায়গায় স্টেরলেট ধরতে হবে।

এক জায়গায় মাছ ফুরিয়ে গেলে ভোঁদড় চলে যায় অন্য আরেকটা জায়গায়। মাত্‌ভেই গ্রিগোরিয়েভিচও তার চিহ্ন অনুসরণ করে তার সন্ধান পায় কাছেই দ্বিতীয় আরেকটা স্টেরলেট ডেরার।

'শীতকালে তাইগার নদীতে এই জন্তুগুলোর জন্যে মন ভালো থাকে,' বললে মাত্‌ভেই গ্রিগোরিয়েভিচ। 'মনে হয় যেন একলা নই, কাছেই আরেকজন জেলে আছে...'

এই সময় উইলো গাছের ডালে দেখা গেল মরকত-শ্যাম একটি পাখি — মাছরাঙা। বুড়ো জেলে তাকে বলে স্রেফ নীল চড়ুই।

পাখিটার দিকে সোহাগ করে তাকিয়ে সে বললে, 'এ পাখিটাকে ভারি ভালোবাসি। নীল চড়ুই আমাদের এখানে উড়ে আসে বসন্তে, নদীর খাড়াই পাড়ে ঠোঁট দিয়ে গর্ত খুঁড়ে ডিম পাড়ে। ছানাদের খাওয়ায় মাছ। তাই আমিও জেলে, নীল চড়ুইও জেলে; আমি সততার সঙ্গে খেটে মাছ ধরি, সেও তো চুরি করে না।'

মাছরাঙা কেমন পাশকে ভঙ্গিতে তাকিয়ে ছিল জলের দিকে, থেকে থেকেই গলা নাড়াচ্ছিল, যেন কোনো কড়া ইস্ত্রিকরা উঁচু কলারে তার অসুবিধা হচ্ছে। এক মিনিট পরেই নদীতে ছলাৎ শব্দ উঠল, জলের মধ্যে তলিয়ে গেল পাখিটা। জলের বৃত্তগুলো সরে যাবার পর দেখলাম, পাখিটা তার সবুজ ডানা দিয়ে খাশা জল কাটছে। সেকেন্ড তিনেক বাদেই মাছরাঙা ঠোঁটে মাছ নিয়ে জল থেকে খলবলিয়ে উঠে ফিরে এল তার ডালটায়, বারকয়েক ডালে ঘা মারলে মাছটা দিয়ে। মাছটার ছটফটানি থেমে গেল। শক্ত করে ঠোঁটে মাছটা চেপে পাখিটা শনশনিয়ে উড়ে গেল জলের ওপর দিয়ে তার বাসার দিকে। নদীর আঁকাবাঁকা অনুসরণ করে উড়ছিল ডানাওয়ালা 'জেলে', শিগ্‌গিরই তা বাঁকের আড়ালে অদৃশ্য হল।

কিছুক্ষণ পরে মাছরাঙা ফের এসে বসল তার চৌকিদারী ডালে।

'একা-একা যাতে না লাগে, তাই আমি আমার এই বন্ধুর জন্যে তীরে একটা কাঠি পুঁতে দিয়েছি,' বললে মাত্‌ভেই গ্রিগোরিয়েভিচ। 'অবিশ্যি নদীতে ডাল অনেক, কিন্তু মাছ ধরার পক্ষে যুতসই হবে, তেমন কাঠি কম। না ভেবে-চিন্তে কাঠি পুঁতলে সেখানে যদি মাছ বেশিও থাকে, তাহলেও বন্ধু নীল পাখিটি উপোস দিতে পারে। সরু ডাল থেকে জলে ছোঁ মারায় অসুবিধা হয় পাখির — সরু ডাল হলে তার 'উল্টো ঘাই'টা হয় প্রচন্ড, তাই জলে-শিকার ফসকে যায়। কড়া ডালও কাজ দেয় না। সামান্য একটু উল্টো ঘাইয়ে নীল চড়ুই অভ্যস্ত। তাই সবকিছু হওয়া চাই

যুতসই... ছোটো ছোটো মাছগুলোর জন্যে আমি জলে শুকনো পাঁউরুটির টুকরো ছড়িয়ে দিই।'

তখনই আমার বোধগম্য হল, কেন মাছরাঙাটা মাছের ওপর নজর রাখে কেবল একই ডাল থেকে, কেন এইসব 'যুতসই' আর 'উল্টো ঘাই' ইত্যাদির কথা বলছে বুড়ো। প্রকৃতিকে ভালোই লক্ষ্য করেছে সে।

মাছরাঙা শুধু সেই ডালই ভালোবাসে যার স্থিতিস্থাপকতা খুব বেশিও নয়, কমও নয়, অর্থাৎ যা দিয়ে স্প্রিং-বোর্ডের কাজ হবে। এই রকম স্প্রিং-বোর্ড থেকে লাফ দিয়ে পাখি শিকার ধরতে পারে সুনিশ্চিত।

'হ্যাঁ, নীল চড়ুইকে ভালোবাসি আমি,' ফের বললে বুড়ো। 'এই ডোরাকাটা চোর বুরুন্দুকটার মতো নয় — এটা তক্কে তক্কে থাকে কী করে কিছু খাবার জিনিস চুরি করে লুকিয়ে রাখবে নিজের গর্তে। ওইতো এখন ওরা চ্যাঁচাচ্ছে 'ব্রুম-ব্রুম'। কারণ কী জানেন?

'কারণ শুখা পাঁউরুটির থলেটা আমি সরু সুতোয় টাঙিয়ে রেখেছি একটা ফোঁকড়িতে। এর আগে একদিনের জন্যে ছাউনি ছেড়ে যাই। বুরুন্দুকরা ঠিক গন্ধ পেয়ে যায় কী আছে থলিতে, কামড়ে ফুটো করে তাতে। টুকরো টুকরো রুটি থাবা দিয়ে মুখে পুরে ফোলা গালে ছুটে যায় নিজেদের গর্তে। থলে ছিল টায়-টায় ভরা, ফিরে দেখি ঠন-ঠন করছে; ডোরাকাটা পরগাছাগুলো মেরে দিয়েছিল অনেক! আর এখন গোটা ত্রিশেক বুরুন্দুক জুটেছে থলের নিচে, তাকিয়ে দেখছে, কিন্তু নাগাল পাচ্ছে না।'

মাত্‌ভেই গ্রিগোরিয়েভিচ একটুখানি থামল, কান পেতে শুনে ফের শুরু করল।

'কতকগুলো অনেক ঘোরাঘুরি করে, কোনো ফয়দা হল না দেখে পালিয়ে গিয়ে এখন চেঁচাচ্ছে 'ব্রুম-ব্রুম'। ওই ওদের এক স্বভাব — বাজ ডাকল, কি কেউ বন্দুক ছুঁড়লে, কিংবা কোনো একটা দুর্বিপাক ঘটল, অমনি বুরুন্দুকেরা ভান করে যেন কত কষ্ঠ, গাছের গুঁড়ির ওপর বসে মাথা চেপে ধরে করুণ স্বরে ডাকে 'ব্রুম-ব্রুম'... এখন ওদের বিপদ এই যে মুফতে পাওয়া খাবার গেছে ফুরিয়ে, ফের আবার তাইগা ঢুঁড়ে নিজেদেরই জোটাতে হবে।'

একটু চুপ করে থেমে ছেলেদের সে জিজ্ঞেস করল:

'আচ্ছা, তোমরা তো বিজ্ঞানী, দহে পড়ার আগে অল্প জলে নৌকোটা আটকে রাখার জন্যে দু'মনী পাথর চাপাতে পারবে নৌকোয়? কেননা স্টেরলেট মাছ থাকে কেবল সেইসব জায়গায়।'

ওদের জবাব শুনে সে কেবল হাসল, বলল:

'তলিয়ে যাবে!'

'আর, তুমি, আলেক্সান্দ্রভিচ,' আমায় সে জিজ্ঞেস করলে। 'তোমার তো সবই জানা।'

বললাম, 'এখনো ও কাজ করার সুযোগ হয় নি, তবে দরকার পড়লে চাপাব। জলে পাথরের জোর নেই, হ্যাঁচকা টান মারলে আপনিই তা চট করে উঠে আসবে, থামতে না দিলে এমনিতেই তা জাড্যের তাড়নায় জলের ওপরে ভেসে উঠবে। শুধু নৌকার কানা পেরিয়ে চাপিয়ে দিলেই হল, সঙ্গে সঙ্গেই দাঁড় নিয়ে স্রোতের দিকে নৌকোর মুখ ফেরাতে হবে।'

ভীত মুখে মাত্‌ভেই গ্রিগোরিয়েভিচ চাইল আমার দিকে, সশঙ্কে জিজ্ঞেস করল:

'কে তোমায় বলেছে বলো তো?'

বললাম, 'আর্কিমিডিস।'

'কোথায় থাকে সে?'

'মারা গেছে।'

'শুধু তোমায় বলেছে, নাকি সবাইকে? এটা যে আমাদের বংশের গুপ্ত কথা, ঠাকুর্দার বাবার কাছ থেকে তা চলে আসছে। তাই আমি ছাড়া কান-নদীতে স্টেরলেট মাছ ধরতে পারে না আর কেউ।'

বললাম যে আর্কিমিডিস সে কথা লিখে গেছেন পদার্থবিদ্যার পাঠ্যপুস্তকে (আপেক্ষিক গুরুত্ব), তবে তাদের গ্রামে নিশ্চয় খবরটা পৌঁছয় নি।

'যখন কান ছেড়ে ইয়েনিসেই নদীতে যাবে, কাউকে আর্কিমিডিসের কথাটা বলো না কিন্তু, নইলে নদীতে আর স্টেরলেট মাছ মিলবে না! কিন্তু কে ওকে শেখাল?'

বললাম, 'নিজেই মাথা খাটিয়ে বার করেছে।'

ধুনির কাছে বুড়ো অনেকখন বসে রইল। মাথা নেড়ে বললে:

'লোকটার মাথা আছে বটে, পরিষ্কার!.. কী যেন নাম?'

'আর্কিমিডিস,' বললে ছেলেরা।

বিদায় নেবার সময় মন ভার হয়ে গেল তার।

'শহর থেকে ইচ্ছে করে তাইগায় আসছে, তোমাদের মতো তেমন লোক আমি দেখি নি। তোমাদের ছাড়া একা-একা আমার খারাপ লাগবে। অথচ আগে কখনো এমন হয় নি।'

আর সত্যিই, পরের দিন সে এসে আমাদের সঙ্গ ধরল।

মরুভূমিতে

মরুভূমির বালিতে দিন কয়েক কাটালেই টের পেতে হয় নির্মল জলের সরোবর আর নদী ছাড়া জীবনধারণ আমাদের থেকে কত তফাৎ। সেখানে আকণ্ঠ পান করা যায় কেবল গ্রীষ্মের বিরল বৃষ্টিপাতের পর দ্রুত মিলিয়ে যাওয়া ডোবাগুলো থেকে। ১৯১৩ সালের গ্রীষ্মের শেষে ১০টি উটের ওপর মাল চাপিয়ে আমাদের আমু-দরিয়ার বদ্বীপ থেকে কিজিল-কুম (লাল বালি) মরুভূমি দিয়ে কাজালিনস্ক শহর পর্যন্ত একটা লম্বা পথ পাড়ি দিতে হয়েছিল। আরল সাগরে পড়া আরেকটা মহানদী, ঘোলা জলের সির-দরিয়ার কাছেই শহরটা। দুই কুঁজের পাঁচটা উটের পিঠে ছিল মাটি, জন্তু-জানোয়ার, উদ্ভিদ, পাখি, সাপ ইত্যাদির নমুনা। বাকিগুলোয় ছিল জলের পিপে আর বড়ো বড়ো ফ্ল্যাস্ক, কেননা গোটা পথে পাওয়া সম্ভব কেবল নোনা জল, তাও বহুকাল আগে খোঁড়া গভীর কুয়োগুলোয়। কোনো প্রস্রবণ বা নির্মল জলের সরোবর ছিল না এই জনহীন এলাকাটায়। ভুট্টা আর জোয়ারের ক্ষেত ছাড়িয়ে শেষ ক্যানেলটি পেরিয়ে আমরা চললাম প্রায় অলক্ষ্য হাঁটাপথ দিয়ে, বালিয়াড়িগুলোর মধ্যে তা কখনো মুছে গেছে, কখনো উঠেছে তাদের চুড়োয়। বালিতে নরম পদক্ষেপে যাচ্ছিল উটগুলো, ঝুরঝুরে বালিতেও তাদের চওড়া পায়ের পাতা ডুবছিল না। শেষে বালিয়াড়ি হয়ে উঠল নিচু-নিচু, প্রায়ই দেখা যেতে লাগল অদ্ভুত, প্যাঁচানো প্যাঁচানো সাকসাউল গাছ। জোর বাতাস বইছিল, মিহি বালিতে ঢাকা পড়ছিল সমস্ত চিহ্ন, উট যাবার পথটাও।

শুধু ঘন ঘন দেখা পাওয়া, রোদে শাদা হয়ে ওঠা উট, কখনো বা কুকুর কি অন্য কোনো গৃহপালিত জীবের কঙ্কাল থেকে বোঝা যাচ্ছিল পথটা কত কঠিন,

তাহলেও কারাভান পথের সঠিক নিশানা মিলছিল তা থেকে। ঝোপ থেকে ঝোপে উড়ে যাচ্ছিল একঝাঁক মরুভূমির চড়ুই। কৌতূহল বোধ করে আমি তাদের পেছু পেছু পথ থেকে সরে যাই। সাকসাউল গাছের ডাল খাচ্ছিল কতকগুলো জাইরান হরিণ, তারা আমায় সরিয়ে নিয়ে যায় আরো দূরে... মোটের ওপর, আমার সহযাত্রীদের সঙ্গ ধরতে হয়েছিল চিহ্ন ধরে ধরে, তবে উটগুলো যাচ্ছিল অনেক তাড়াতাড়ি...

তাকিরে (বালিয়াড়ির মাঝখানে চেপ্টা ডাঙ্গা) নেমে দেখলাম, মাটিতে গলা বাড়িয়ে শুয়ে আছে একটা উট, একটু দূরে মনমরার মতো বসে আছে এক বৃদ্ধা, তার খানিকটা আগে নতনেত্র দীর্ঘাঙ্গী এক কাজাখ তরুণ, মুখে তার চূড়ান্ত অবসন্নতার ছাপ। চুপ করে ছিল তারা।

'কী ব্যাপার?' কাজাখ ভাষায় যেমন পারি জিজ্ঞেস করলাম।

'উটটা মারা যাচ্ছে, মারও অবস্থা খারাপ,' ঘড়ঘড়ে গলায় বললে ছেলেটা, 'জল নেই, জল দরকার।'

জানা গেল, কারাভানের সর্দার, কাজাখ দেলিম নবীন ভূতাত্ত্বিক ব. ন. সেমিখাতভের কথা শোনে নি, জল দেয় নি এদের। গোটা মরুভূমিটা তারা প্রায় পাড়ি দিয়ে এসেছে, এখন আমু-দরিয়ার উপত্যকায় পেঁছবার মুখে তারা জলের অভাবে এতই কাহিল হয়ে পড়েছে যে হয়ত আদৌ গিয়ে পেঁছবে না। যেমন পারলাম বুঝিয়ে বললাম যে কারাভানটার সঙ্গ ধরে আমি জল নিয়ে আসব, ওরা যেন অপেক্ষা করে। ভাগ্যি ভালো যে বেশি দূর যেতে হবে না, পাঁচ কিলোমিটার পথ। তিনজন কাজাখ আর নবীন ভূতাত্ত্বিকটি রাত কাটাবার জন্যে থেমেছিল, মাল খালাস করছিল উটগুলোর পিঠ থেকে।

'লোককে জল দেন নি কেন?' কড়া করে জিজ্ঞেস করলাম সর্দার কাজাখ দেলিমকে।

মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে সংক্ষেপে সে রুশীতে জানিয়ে দিলে:

'মরুভূমি — বিস্তর পথ। সবাইকে জল খাওয়াতে হলে নিজেরাই মারা পড়ব।'

তাহলেও খানিকটা কথাবার্তার পর সে বড়ো একটা কেটলির আধখানা পর্যন্ত জল ঢাললে, আমি সেটা পুরো করে দিলাম। লাল সুরায় ঈষৎ টোকো জল আমরা নিয়ে গেলাম উটে করে। ছেলেটা প্রথমে জল খেতে চাইলে না, দেখালে মায়ের দিকে। অল্প অল্প করে চুমুক দিল সে, ভেজাল আশুষ্ক জিভ আর গলা। উটেরও মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল — ১২ দিন সে জল খায় নি, যেসব কুয়ো আমাদেরও

ভরসা, তাতে জল ছিল না। শুকনো কুয়োতে পড়া সাপ, মরুভূমির তোলাই খরগোস আর অন্যান্য জীবজন্তুর মৃতদেহ পূতিগন্ধ ছাড়ছিল। প্রথমে ন্যাকড়া ভিজিয়ে গুঁজে দেওয়া হল উটের মুখে, তারপর খানিকটা জল খাওয়ানো হল। সহনশীল জীবটি উঠে দাঁড়াল শিগ্‌গিরই। বাকি জলটা ওরা ঢেলে রাখলে খালি মগে। চাঙ্গা হয়ে উঠল সবাই, ছেলেটা বার কয়েক কোলাকুলি করলে আমার সঙ্গে, মায়ের চোখ ভরে উঠল জলে, বিদায় নিলাম আমরা। দামী জলের বেহিসাবী খরচায় দেলিম খুশি হয় নি, এ সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে কথা বলে নি সে। তবে যে দুই ছোকরা কাজাখ তাকে ভয় করত 'কারাভানের আকসাকাল' (মোড়ল)-এর মতো তারা কিন্তু ইঙ্গিতে যথাকালে সাহায্যের জন্যে অনুমোদন জানিয়েছিল।

অন্ধকার হয়ে এল, থিতিয়ে এল বাতাস, ঠাণ্ডা পড়ল। মরুভূমিতে আমি ফেল্ট-বুট পরে পাড়ি দিয়েছি, সেটা খামোকা নয় — রোদে গরম বালির ছ্যাঁকা লাগে না, ঝুরঝুরে বালির গাদায় ডুবে যায় না পা, ঠাণ্ডা লাগে না রাত্রে।

সাকসাউল কাঠের ধুনি বেশ ভালো জ্বললেও সবাই যখন ঘুমুচ্ছিল, তখন তা নিবে যায়। সূর্য ওঠার সময় বালি একটু গরম হতেই দেখা দিল কালচিটে কাঁচপোকা। কে জানে কোত্থেকে উড়ে এল বড়ো বড়ো গুবরে পোকা; রাতের মধ্যে উটের কাছে যেসব গোবর জমেছিল, তা তারা নিঃশেষ করে গুলটি পাকিয়ে পেছনের পা দিয়ে ঠেলে নিয়ে গেল নানান দিকে।

সবাই ঘুমুচ্ছে, আমি এগিয়ে গেলাম একটু দূরে। চারিদিক এমন চুপচাপ যে বুকের স্পন্দনও শোনা যায়। একটা শব্দ নেই কোথাও! লোকে এখানে যে মৃদু স্বরে কথা বলে, সেটা খামোকা নয়। কিন্তু এটা কী? সোজাসুজি আমার দিকে আসছে কী-একটা যেন ফোলা-ফোলা বালির ফালি। শুধু কাছে আসতেই আমার চোখে পড়ল বেশ মোটা একটা বেলে বোড়া সাপের চোখ আর মাথার একাংশ। গিরগিটি আর ইঁদুরের খোঁজে বালির তল দিয়ে আসছিল সে। আমার হাতের একটা অসতর্ক ভঙ্গিতে সাপটা মুহূর্তের মধ্যে তলিয়ে গেল বালিয়াড়ির গভীরে।

গোল-মাথা চটপটে গিরগিটিরা বিপদ টের পেয়েই লুকিয়ে যাচ্ছিল বালির মধ্যে, সবকটা চার পা আর গা দিয়ে বালি খুঁড়ে যেন তলিয়ে যাচ্ছিল তাতে। বড়ো বড়ো আগামা গিরগিটিগুলো তামারিস্ক ঝোপের ওপরে উঠে সোনাপোকা ধরছিল। মাকড়সার মতো দেখতে বড়ো বড়ো বিষাক্ত ফালাঙ্গ কীটগুলো দ্রুত লুকিয়ে পড়তে চাইছে দিনের আলো থেকে। বাতাসে বালি উড়ে পাশেই যে একটা খাদের

মতো হয়েছে, সেখানে শোনা গেল যেন পাখির ডাকাডাকি। সন্তর্পণে তার ধারে গিয়ে দেখলাম ধেড়ে ইঁদুরের মতো আকারের বাদামী রঙা বহু মূষিকজাতীয় প্রাণী। এগুলো হল বড়ো বড়ো বেলে ইঁদুর। আমার প্রতিটি পদক্ষেপেই 'গান' তাদের বেড়ে উঠে একেবারে ঐকতান শুরু করল, শেষে গঙিয়ে-ওঠা একটা ইঁদুরের তীক্ষ্ন চিৎকারের পর হঠাৎ সব থেমে গেল, লেজ নেড়ে তারা উধাও হয়ে গেল তাদের বিবরে।

দিনে যে মরুভূমিকে মনে হয় ঢেউ-খেলা প্রাণহীন বালুর স্তর, সকালে সেখানে সাপ, গিরগিটি, কাছিম, কীট, জেরবোয়া, পাখি — প্রভৃতি নানা প্রাণীর পদচিহ্নের আশ্চর্য নক্সা।

বেলে ইঁদুরের শত্রু মেঠো বেড়ালের চিহ্নও দেখা গেল, আর নোনা সরোবরের তীরে, যেখানে সবুজ শস্য গজায়, সেখানকার বালিটা ছোটো ছোটো খরগোসের মতো দেখতে এক ধরনের প্রাণী তোলাইয়ের পায়ে পায়ে মাড়ানো।

সূর্য ওপরে উঠল, বালিতে তপ্ত বাতাসের ফোয়ারা ছুটল। দেখা দিল অদ্ভুত সব মরীচিকা। আতপ্ত হয়ে উঠল পূবের ঢালুর বালি, ঝড়ে মুছে গেল জন্তুদের রাখা সমস্ত চিহ্ন, যেভাবে ব্ল্যাকবোর্ড থেকে মুছে যায় খড়ির দাগ। গরম বালি থেকে আত্মরক্ষা করে জীবজন্তুরা খানিকটা ঠান্ডা স্তরে গিয়ে ঢোকে। হাওয়ার জোর কেবলি বাড়ে, উড়িয়ে নিয়ে যায় ঝোপঝাড়ের গোল গোল বীজ। বালির সঙ্গে মিশে তা সেই সঙ্গে নিয়ে আসে এঁটুলি, শুধু খরগোস, হরিণ, উটের নয়, মানুষেরও রক্ত খায় সে এঁটুলি। বীজ আর এঁটুলি সাধারণত আটকে থাকে ঘাসে, আর যেখানে ঘাস, সেখানেই জল। আর ঘাস আর জল যেখানে, জীবজন্তুও সেখানে বেশি। মরুভূমিতে এঁটুলিরা শুধু বাতাসেই বাহিত হয় না, নিজেরাই তারা বেশ তাড়াতাড়ি দৌড়য়, জীবজন্তুর চিহ্ন অনুসরণ করে তাদের পাকড়াও করে।

মাঝে মাঝে আমরা একদিন জিরবার জন্যে থামতাম। কতবার তখন দেখেছি, মরুভূমির ঝোপঝাড় থেকে বেরিয়ে পড়েছে কতগুলো এঁটুলি, ছুটে এসেছে আমার চিহ্ন ধরে। হাঁটার গতি কমিয়ে খানিকটা ঘন গাছপালার কাছ দিয়ে যাবার সময় কয়েক গন্ডা করে অনুসরণকারী এঁটুলি দেখেছি আমি। রুমাল ছুড়ে দিলে তারা সঙ্গে সঙ্গেই তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ত, কিন্তু তক্ষুনি তা ছেড়ে দিয়ে ফের অনুসরণ চালাত।

এই পরজীবীগুলো যাতে পেছু পেছু ক্যাম্পে না আসে তার জন্যে আশেপাশে

লাফ দিয়ে পদচিহ্ন গুলিয়ে দিতে হত। উট, জাইরান প্রভৃতি যেসব জন্তু মরুভূমির সাকসাউল, তামারিস্ক ইত্যাদি গাছ খেতে আসে, এ'টুলিগুলো তাদের পা বেয়ে উঠে রক্ত খেতে শুরু করে।

মরুভূমিতে স্বতঃই একটা প্রশ্ন জাগে: কাঁটাগাছ, কালিগনুম ঝাড়ের মতো ছোটো ছোটো উদ্ভিদগুলো জল পায় কোত্থেকে?

হাওয়ায় যেখানে মাটির কণা উড়ে গিয়ে গর্তের মতো হয়েছে, সেখানে ভাঙাচোরা মাটির গায়ে এমন সব শিকড় বেরিয়ে থাকে, যা মাটির ওপরকার ডালের চেয়ে বহুগুণ মোটা, যেন গাছের সত্যিকারের এক কান্ড রয়েছে মাটির নিচে, বহু ডজন মিটার গভীরে তা নামে। গভীর ভূস্তর থেকে এইসব শিকড় জল জোগায় মাটির ওপরকার শাখাগুলোয়।

দক্ষিণ-পূর্বের দিকে উড়ে চলা ছোটো ছোটো পাখির ঝাঁক দেখেও অবাক লেগেছিল আমাদের। তাদের মধ্যে ছিল কিঙ্গলেট, এমনকি সিনিচ্‌কা পাখিও, যাদের ধরা হয় স্থিতু পাখি বলে। উল্টো দিক থেকে হাওয়া বইছিল, তাই মাটিতে নেমে ঝোপ থেকে ঝোপে উড়ে যেতে হচ্ছিল তাদের। খুবই কষ্টকর ওদের পরিযাণ! মরুভূমির সব ব্যাপারই অসাধারণ এবং অবিস্মরণীয়।

কিজিল-কুম দিয়ে তিন সপ্তাহের যাত্রায় পথের দুরূহতা, মরুভূমির উদ্ভিদ ও প্রাণীদের স্বকীয় ধরনের জীবনযাত্রার স্মৃতি যে ছাপ রেখে গেছে তা মুছবার নয়।

কাজাখরা ছিল আমাদের কারাভানের উটগুলোর মালিক। আমাদের সঙ্গে তারা এই প্রথম এল রেলপথে, আগে এ সম্পর্কে তারা শুনেছিল কেবল লোকমুখেই। ধোঁয়া আর আগুন উদ্গীরণ করে, প্ল্যাটফর্ম কাঁপিয়ে যখন আমাদের সামনে দিয়ে সগর্জনে চলে গেল এক্স্‌প্রেস ইঞ্জিনটা, থামল রিজার্ভ করা সীটের গাড়িগুলো, তখন তারা দাঁড়িয়ে রইল একেবারে আড়ষ্ট হয়ে। 'শয়তানের গাড়িটা' সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল একেবারেই অন্য রকম। আমাদের মালপত্রগুলো ওয়াগনে ওঠাতে সাহায্য করে তারা। সেখানে লিফ্‌ট্‌ বাঙ্ক, ছাইদানি, জানলার ওঠানো-নামানো কপাট দেখে তাজ্জব বনে যায়। শুধু দ্বিতীয় ঘণ্টির পরেই তারা বহু কষ্টে বিদায় নেয় এই অদৃষ্টপূর্ব অদ্ভুতের কাছ থেকে। আমার পথ তো তুলনায় সংক্ষিপ্ত — কাজালিনস্ক — মস্কো, কিন্তু ওদের সামনে এখন সীমাহীন বালি আর সাকসাউল ঝোপ আর প্রাচীন সমুদ্রের বিদঘুটে সব অবশেষ, রোদে ঝলমলে ঝিনুক-শাঁখ পেরিয়ে দীর্ঘ পাড়ি।

আর গিয়ে বহুদিন ধরে শোনাবে 'শয়তানের গাড়ি'র গল্প। এই ছিল আগের অবস্থা!

তারপর থেকে কাটল প্রায় ৫০ বছর, কিন্তু কী বদলে গেছে সবকিছু! কিজিল-কুম মরুভূমি দিয়ে এখন নিয়মিত চলছে বাস; সেচ-ব্যবস্থায় ও ক্ষেতে যন্ত্র এখন স্বাভাবিক; কাজাখরা পড়ছে উচ্চ শিক্ষায়তনে, আছে তাদের নিজস্ব বিজ্ঞান আকাদমি; হাজারো বছর ধরে লোকে যেখানে ভুগেছে গোলামি আর নিঃস্বতায়, সোভিয়েত ব্যবস্থা মারফত আজ সেখানে সংস্কৃতির জয়যাত্রা।

পশুর বুদ্ধিমত্তা
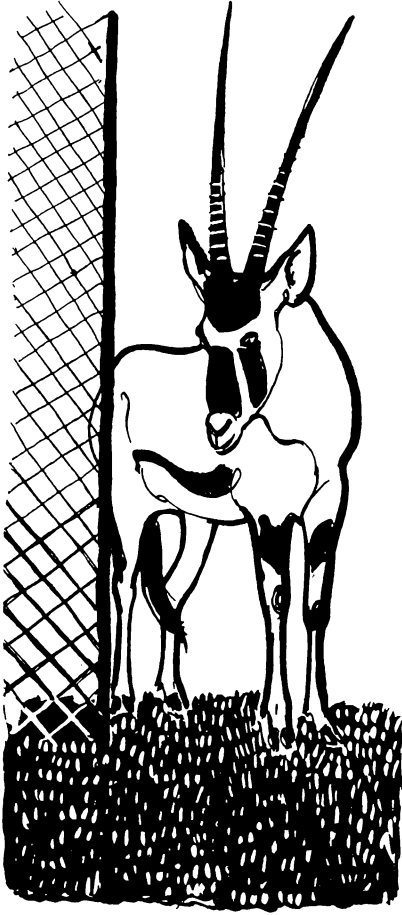
রূপকথার ছেয়ে নেকড়ে, সেয়ানা শেয়াল-দিদি, কিংবা ঝাঁকড়া-লোম বেয়াড়া ভালুকের কাণ্ড-কারখানার কথা আমাদের কে না-জানে। এইসব গল্পের প্রভাবে অনেকেই জন্তু-জানোয়ারের সামর্থ্য বড়ো করে দেখে, তাদের ওপর আরোপ করে মেধা বা বুদ্ধিমত্তার মতো মানবীয় গুণ। মাঝে মাঝে আমাদের জিজ্ঞাসা করা হয়, 'পশুদের কি বুদ্ধি আছে?' কী উত্তর দেব তার? অবশ্যই মানবোচিত বুদ্ধি ওদের নেই। তাদের সমস্ত ক্রিয়াকলাপই হল প্রকৃতির মধ্যে তাদের জটিল জীবনযাত্রা পরিস্থিতি এবং পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার প্রক্রিয়ায় গড়ে ওঠা রিফ্লেক্স, বা পরিবর্ত ক্রিয়ার ফল।

পশুদের বুদ্ধিমত্তা কতটা তা যাচাই করার জন্যে একবার মস্কো চিড়িয়াখানায় একটা পরীক্ষা চালাই আমরা। আফ্রিকা থেকে সদ্য আনা একদল বেইজ কৃষ্ণসার মৃগকে আমরা লোহার জাল দিয়ে ঘেরা একটা জায়গায় রাখি। একই রকম জালি-বেড়ায় জায়গাটা দু'ভাগে ভাগ করা হয়, তার একটা ভাগে আমাদের চতুষ্পদ বন্দীরা থাকে অনেক দিন। প্রথমটা তারা গোঁ ধরে বেড়া ভেদ করে যাবার চেষ্টা করে, কিন্তু তাতে কোনো ফল হয় না। লোহার জালি-বেড়াটা ছিল বেশ মজবুত। ক্রমশ বেড়া ছাড়িয়ে না যাওয়া অভ্যেস হয়ে গেল ওদের। তখন আমরা ভেতরকার পার্টিশনটা তুলে নিই। কেউ কেউ ভেবেছিল যে এবার সারা জায়গাটায় ছুটে বেড়াবে হরিণগুলো। কিন্তু মোটেই তা হল না: যে রেখা বরাবর বেড়াটা ছিল তা পেরুবার সাহস হল না কারো, এই 'বুদ্ধিমত্তাটুকু' তাদের ছিল না। তুলে নেওয়া বেড়ার রেখা পর্যন্ত

ছুটে এল হরিণগুলো, তারপর আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। যেকোনো বেড়ার চেয়ে তাদের অনেক বেশি ভালো করে আটকে রেখেছিল বিগত সপ্তাহগুলোয় গড়ে ওঠা প্রতিবর্ত: তখন লোহার জাল ভেদ করার কত চেষ্টাই তো করেছিল, কিছুই যে হয় নি।

ইউক্রেনের আস্কানিয়া-নোভা সংরক্ষিত জীবাঞ্চলে একই রকম পরীক্ষা চালানো হয় হরিণ, লামা আর উটপাখি নিয়ে। সেখানেও তুলে নেওয়া বেড়ার সীমানা পেরবার সাহস কারো হয় নি অনেকখন।

আমাদের পশু-পালন কেন্দ্রগুলোতেও পশুদের সামর্থ্য বাড়িয়ে ধরা হচ্ছে, এমন ঘটনা কম নেই। সেবল আর মার্টিনদের রাখার জায়গাটায় লোকে প্রায় গোটা মেঝে জুড়ে লোহার জাল পেতে রাখে। সেটা করা হয় যাতে জন্তুগুলো মাটির তলে গর্ত খুঁড়ে খাঁচা থেকে না পালায়। তবে এ সাবধানতা নিষ্প্রয়োজন! মস্কোর চিড়িয়াখানায় সেবল আর মার্টিনরা যেখানে থাকত, তার মেঝে মাটির, কিন্তু সুরঙ্গ খুঁড়ে পালাবার কথা কারো মাথায় আসে নি। বলাই বাহুল্য, ছাড়া পাবার চেষ্টা করে দেখেছে সবাই, কিন্তু সে প্রচেষ্টায় সাফল্যলাভের মতো 'বুদ্ধিমত্তা' তাদের ছিল না। খাঁচা থেকে পালাবার চেষ্টায় তারা সোজা আসে জালি-বেড়ার কাছে, সেখানে বাধা পেয়ে ওইখানেই তারা মাটি খুঁড়তে শুরু করে। আগেই সেটা আন্দাজ করে আমরা বেড়া বরাবর অল্প প্রস্থের তক্তা পেতে রেখেছিলাম, তার ওপরে দিয়েছিলাম সামান্য মাটি। সুরঙ্গ খুঁড়তে গিয়ে সেবল আর মার্টিনরা কেবল তক্তা আঁচড়েই ক্ষান্ত হয়, কোনো ফল মেলে না, অথচ বেড়া থেকে মাত্র বিশ সেণ্টিমিটার দূরে খুঁড়লেই তক্তার তলা দিয়ে বাইরে যেতে কোনোই অসুবিধা হত না তাদের।

বাঘ-সিংহের 'বুদ্ধিমত্তা'ও বেশি নয়। চিড়িয়াখানায় প্রায়ই তাদের আলাদা করে রাখা হয় আধা প্লাই-উডের পার্টিশন দিয়ে, প্রচণ্ড থাবার এক ঘায়েই যা ভেঙে পড়বে। কিন্তু শক্ত দেয়ালের মধ্যে বেড়ে ওঠা এই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হিংস্র জন্তুগুলো ভাবতেই পারে না যে অমন পলকা পার্টিশন ভাঙা সম্ভব। খাঁচার মধ্যে থাকা রপ্ত করিয়ে আমরা ওদের একটা নতুন অভ্যাস গড়ে দিই — তাতে নিজেদের কায়েমী জায়গা ছেড়ে যাবার কোনো চেষ্টাই করে না তারা। এইসব প্রতিবর্ত এমন পাকা হয়ে ওঠে যে দরজা দিয়ে আগে কখনো না বেরিয়ে থাকলে তাকে খোলা দরজা দিয়ে জোর করেও বার করা যায় না।

সবাই জানি যে ফুটকিদার হরিণ লাফাতে পারে খাসা। কিন্তু অপেক্ষাকৃত নিচু বেড়া ডিঙিয়ে আমাদের কোনো হরিণ মুক্তিলাভের চেষ্টা করেছে, এমন ঘটনা ঘটে নি একটিও। কোপেৎ-দাগ ভেড়ার বেলাতেও সেই ব্যাপার। যে জায়গাটা তাকে দেওয়া হয়েছিল, সেখানেই সে চুপচাপ কাটায় কয়েক বছর। কিন্তু একদিন রাতে চিড়িয়াখানায় একটা কুকুর ঢুকে কোপেৎ-দাগ ভেড়ার ওপর হামলা করে। তখন সে অনায়াসে তার বেড়া লাফিয়ে যায়। এক্ষেত্রে অভ্যস্ত প্রতিবর্তের চেয়ে জন্মগত প্রতিবর্ত ছিল জোরালো।

বানরদের কথা না ধরলে, বাদামী ভালুক হল অন্য সমস্ত জন্তুর চেয়ে বেশি উদ্যোগী। খাঁচার লিফ্‌ট্‌ দরজা দিয়ে বেরবার কথা বাঘ, সিংহ, চিতাবাঘ, কারো কখনো মাথায় ঢোকে নি, অথচ তোলা তা খুবই সহজ। কিন্তু চিড়িয়াখানার কর্মচারী দরজাটা কীভাবে তুলছে তা একবার দেখলেই হল, অমনি 'ট্যারা-পেয়ে' জন্তুটিও ঠিক তাই করবে! তবে সঙ্গী যাতে বেরিয়ে যেতে পারে, তার জন্যে তাকে পিঠে চাপতে দেওয়ার কথা তার মাথায় খেলবে না। যদিও তিন বছুরে মনুষ্যশিশুও তা আন্দাজ করতে পারে অনায়াসে।

আমাদের প্রকাণ্ড ভালুকটির নাম 'বরেৎস্‌' (যোদ্ধা)। বসন্তে বরফ গলার সময় সে হঠাৎ বড়ো বড়ো থাবায় বরফ তাল পাকিয়ে নিয়ে আসতে লাগল পরিখায়। তারপর পেছনের পায়ে ভর দিয়ে, তার ওপর চেপে সে সামনের পা বাড়িয়ে দিলে বেড়ায়, যেন মেপে দেখছে, মুক্তিলাভের সময় হয় নি কি? ব্যাপারটা দাঁড়াল ভয়াবহ। কে একজন হুকুম দিলে:

'বোমা!..'

চিড়িয়াখানার কর্মচারীরা গুদামে ছুটে গিয়ে মিনিট খানেকের মধ্যেই ফিরল বোমা নিয়ে। এ বোমা বিশেষ ধরনের। লোকজন বা জন্তু-জানোয়ারের প্রাণের কোনো ক্ষতি হয় না, কিন্তু ফাটে তা কর্ণভেদী গর্জনে।

বরেৎস্‌ যেখানে তার ঢিপি বানিয়েছিল, বোমা ফাটল সেখানেই। বিস্ফোরণে ভয় পেয়ে ঝাঁকড়া দানবটা পরিখা ছেড়ে পালাল। বহুদিন তারপর সে আর সেখানে আসে নি, চেষ্টা করে নি পালাবার। কিন্তু শিগ্‌গিরই ফের সে চিড়িয়াখানার লোকেদের অবাক করলে। কেন জানি, গাছের একটা সবুজ ডালে নজর গেল ভালুকটার। এইটে ছিল সবচেয়ে নিচের ডাল, বাতাসের ঝাপটায় দুলছিল। অনেকখন বরেৎস্‌ মাটি

থেকেই ডালটা ধরবার চেষ্টা করে, অল্পের জন্যে পারছিল না। তখন সে মস্তো একটা পাথর টেনে আনে গাছটার নিচে, তারপর তাতে উঠে সামনের থাবা দিয়ে অনায়াসে ভেঙে ফেলে মোটা ডালটা, যাতে ছিল হাতছানি দেওয়া ওই সবুজ পাতাগুলো। অন্য কোনো ভালুকের পক্ষে এ কাজ সম্ভব ছিল না।

ত্‌বিলিসির চিড়িয়াখানাতে একটা মজার ব্যাপার হয়েছিল। পোষা ভালুকদের দেখা-শোনা করার ভার ছিল যার ওপর, সে একবার ঘেরটার চাবি আনতে ভুলে যায়। চাবি আনতে ফের দপ্তরে যাবার আলস্যে সে ভালুক থাকার জায়গাটার পেছনে আর পাশে যে পাথরের এবড়ো-খেবড়ো দেয়াল ছিল তা বেয়ে ভেতরে ঢোকে। ওদের দিকে ছুড়ে দেওয়া রুটি খাচ্ছিল আধ-পোষা ভালুকগুলো, লক্ষ্য করছিল তাদের খাদ্যদাতাকে। লোকটা তার কাজ শেষ করে দেয়াল বেয়ে বেরিয়ে আসার পর ভালুকগুলোও একই পথে বেরিয়ে পড়ে বাইরে। চারটি জাম্ববানকে তারপর ফের খোঁয়াড়ে ঢোকাতে হয়রানি কম হয় নি! এই ঘটনার পর দেয়ালটাকে সিমেণ্ট দিয়ে ভালো করে সমান করে দিতে হয়েছিল। এসব থেকে বোঝা যায়, ভালুকদের অনুকরণ ক্ষমতা বেশি।

ডানাওয়ালা রক্তচোষার হাত থেকে উদ্ধার

জুনের তপ্ত দিনের শেষে ঘরে ফিরছিল গরুর পাল। বন থেকেই তাদের পেছু নিয়েছিল ডাঁশ আর মশার ঝাঁক, মাথা নেড়ে নেড়ে তাদের তাড়াচ্ছিল তারা। সামনের পশুগুলো তাড়াতাড়ি এই কষ্টের হাত থেকে রেহাই পেতে চাইছিল, তাদের আটকে রাখা মুশকিল হচ্ছিল রাখালের পক্ষে। তা দেখে প্রকৃতির পরিবেশে দেখা বুনো জন্তুদের কথা মনে পড়ল। মনে হবে বুঝি রক্তচোষা, জ্বালিয়ে-মারা, তদুপরি সংক্রামক ব্যাধি-আনা এই পরজীবীদের হাতে এদের অবস্থা দুঃসহ। তবে সেটা শুধুই মনে হওয়া। একটা ঘটনা বলি।

একবার আমু-দরিয়ার বদ্বীপে ঘন সর-হোগলার মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত একটা মস্তো ঘেসো মাঠের ধারে পেঁছিলাম। দেখি, আমার কাছ থেকে কয়েক ডজন মিটার দূরে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা কেঁদো বন-শুয়োর। শক্তিশালী দূরবীনে দেখলাম, শুয়োরটা চোখ বুজে ঢুলছে, আর তার পিঠের ওপর লাফালাফি করছে থ্রাশ-জাতীয় কীট-খাদক সব পাখি। উড়ন্ত ডাঁশ আর বড়ো বড়ো মশাগুলো শুয়োরের চামড়ায় কামড় বসাবার আগেই তারা তাদের ধরে ফেলছে। ঠোঁট ভরা শিকার নিয়ে উড়ে যাচ্ছে তাদের পেটুক ছানাদের কাছে এবং তক্ষুনি ফিরে আসছে। শুয়োরও দিব্যি পাখিদের দৌলতে ডাঁশ-মশার হাত থেকে রেহাই পেয়ে উপভোগ করছে বৈকালিক সূর্যের তপ্ত আমেজ। স্পষ্টই বোঝা যায় এতে উভয় পক্ষেরই লাভ।

মস্কোর ফার ইনস্টিটিউটের লোসিনোওস্ত্রভ বন ঘাঁটিতে চলছিল তৃতীয় বার্ষিকীর ছাত্রদের গ্রীষ্মকালীন ব্যবহারিক তালিম। খাবারের সময় ছাত্রদের চারিদিক খোলা ক্যাণ্টিনটার কাছে খাবারের আশায় সর্বদাই জটলা করত দু'ঝাঁক হাঁসের

ছানা। বনে চরছিল এখানকার দশটা ভেড়া। তপ্ত দুপুরে ডাঁশ, মশা আর মাছির জ্বালায় উত্ত্যক্ত হয়ে তারা ছুটে এসে ক্যাণ্টিনের সামনে ধপ করে বসে পড়ল যেন একেবারে প্রস্তর মূর্তি। রোঁয়া-ঢাকা ডানা মেলে তাদের দিকে এগিয়ে তক্ষুনি উৎপীড়িত প্রাণীগুলোর গায়ে আর মাথায় উঠে পড়ল হাঁসের ছানারা। ভেড়াদের পেছু পেছু উড়ে এসেছিল রক্তচোষারা, কিন্তু ভেড়ার গায়ে বসার সুযোগ পাচ্ছিল কম: লম্বা ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাঁসের ছানারা একেবারে নির্ভুলভাবে বড়ো বড়ো ডাঁশ আর মশাগুলোকে ধরে ফেলছিল গায়ে বসার আগেই। শিগ্গিরই শেষ হয়ে গেল সব রক্তচোষা, হাঁসের ছানারা ফের মন দিল ভোজনরতদের দিকে। সবচেয়ে আশ্চর্য, ভেড়া আর হাঁসের ছানাদের এই নতুন সাপেক্ষ প্রতিবর্ত রপ্ত হয়ে গেছে কত তাড়াতাড়ি। যেন একটা অনুক্ত চুক্তি হয়ে গেছে তাদের মধ্যে, যাতে উভয় পক্ষই আগ্রহী। অথচ হাঁসেরা সাধারণত ক্ষুরওয়ালা জীবের পিঠে ওঠে না, যেমন ওঠে স্টারলিং, কাক, দাঁড়কাক।

যুগের পর যুগ ধরে রক্তচোষাদের হাত থেকে অব্যাহতি লাভের একটা নিজস্ব পদ্ধতি গড়ে উঠেছে এল্‌ক্ হরিণদের ক্ষেত্রে। শীতকালে ওদের ঘাম নিঃসরণের সমস্ত গ্ল্যান্ড মিলিয়ে যায়। এতে শরীরের তাপ জমিয়ে রাখা সহজ হয়, কেননা শত্রুর আক্রমণ থেকে দ্রুত ছুটে পালাবার সময়েও তাদের ঘন লোম ঘামে ভিজে ওঠে না, আর শুকনো লোম তাপ পরিবহণ করে কম। উত্তরী হরিণেরাও শীতে বা গ্রীষ্মে ঘামে না। ভেতরটা যাতে খুব বেশি গরম না হয়ে ওঠে, তার জন্যে অন্যান্য জন্তুদের মতো এরাও ছোটার সময় জিব বার করে দেয়, মুখ হাঁ করে, বরফ তুলে নেয়, ছোটো ছোটো শ্বাস ফেলে ঠাণ্ডা করে নিজেদের। গ্রীষ্মকালে উত্তরী হরিণেরা চলে যায় খোলা-মেলা উঁচু জায়গায়, বাতাস সেখান থেকে উড়িয়ে নিয়ে যায় রক্তচোষাদের, এল্‌ক্ হরিণেরা কিন্তু বনেই থাকে, নিজেদের বাঁচায় অন্য পদ্ধতিতে। বসন্তে লোম ঝরতে শুরু করার সময় থেকে তাদের ঘাম ঝরার গ্ল্যান্ড দেখা দেয়, ফলে গ্রীষ্মে এল্‌ক্ হরিণদের লোম ভিজে ওঠে বাদামী চর্বি-ঘামে। ছোটো ছোটো মশা তো দূরের কথা, বড়ো বড়ো মশা, এমনকি ডাঁশও সেটা এড়াতে চায়। চর্বি-ঘামের ছোঁয়া লাগলে রক্তচোষা পতঙ্গরা মারা পড়ে, কেননা এতে তাদের বন্ধ হয়ে যায় পেটের নিঃশ্বাস পথ। এল্‌ক্ হরিণের গায়ে কামড়াবার মতো জায়গা তাই হল সামনের পায়ের গোড়ালির জয়েণ্ট, পেছনের পায়ের হাঁটু আর কান। রক্তচোষারা পায়ের এইসব জায়গা কামড়ে প্রায়ই রক্তাক্ত ঘা করে তোলে। কামড় এড়াবার জন্যে

এল্‌ক্‌ হরিণরা হাঁটুর ওপর পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অনেকখন, বড়ো বড়ো কান লটপট করে মাথা ডোবায় জলে।

মাঝে মাঝে প্রাকৃতিক দুর্যোগই ঘটিয়ে দেয় রক্তচোষারা। একবার তপ্ত বায়ুস্রোত বা সাইক্লোনের টানে আস্কানিয়া-নোভা'য় ভেসে আসে এমন এক ধরনের মশার ঝাঁক যার কামড়ে জ্বালা করে প্রচণ্ড, প্রায়ই ঘা হয়ে যায়। দু'-তিন দিন ধরে লোকে বাইরে বেরয় নি, দরজা জানলা বন্ধ করে ঘরেই বসেছিল। বিপজ্জনক এই কীটগুলোর কামড়ে বক এবং অন্যান্য অনেক পাখির ছানা মারা যায় তাদের বাসায়। ঢোকে তারা সর্বত্র, এমনকি মশারির জালেও আটকানো যায় না। দিনকয়েক পরে উধাও হয় মশারা, কিন্তু বহু স্তন্যপায়ী জীব, এমনকি ধেড়ে ধেড়ে পাখিকেও খুব জ্বালিয়ে গেছে।

তাশখন্দ শহর এলাকার মশাগুলো খুবই বিরক্তিকর, এদের কামড়ে মানুষের গায়ে বিপজ্জনক ঘা হয়ে যায়। আকাদেমিশিয়ান ইয়ে. ন. পাভলভস্কির পরিচালনাধীন পরজীবীবিদ্যার ইনস্টিটিউট থেকে আবিষ্কৃত হয় যে এই মশাগুলো শীত কাটায় ইঁদুরজাতীয় প্রাণীর বিবরে। ইনস্টিটিউটের কর্মীরা খুবই বুদ্ধিমন্ত পরীক্ষা মারফত দেখান যে বসন্তে শীতের ডেরা ছেড়ে মশারা বহুদূর উড়ে যায়, বড়ো বড়ো শহরে পর্যন্ত পেঁছয়। এর পরে খাটতে হয়েছিল অনেক: শহরকে ঘিরে মস্তো একটা বৃত্ত করে বিষ দিয়ে মারা হয় সমস্ত বেলে ইঁদুর, খুঁড়ে ফেলা হয় তাদের গর্ত। শত শত বছর ধরে যা মানুষকে জ্বালিয়েছে এইভাবেই উদ্ধার মেলে তার হাত থেকে।

একটি ভল্লুক পরিবারের কাহিনী

মর্দা ভল্লুক তার আশেপাশে নবজাতক বাচ্চাদের সইতে পারে না। সেইজন্যে মাদী ভালুক বসন্তে তার বাচ্চাদের নিয়ে এমন জায়গায় চলে যায় যেখানে মর্দা নেই, আর শরতে বাচ্চা সমেত গুহায় গিয়ে ঢোকে সারা শীত কাটাবার জন্যে (ভালুক বাচ্চা দেয় দু'বছরে একবার)।

বছর কয়েক আগে আমরা ঠিক করি, মর্দা ভালুককে বাচ্চাদের সঙ্গে অভ্যস্ত করিয়ে নেব। মস্কো চিড়িয়াখানায় প্রকাণ্ড ভালুক 'বরেৎস্' (যোদ্ধা)-কে রাখা হয় ভল্লুকী 'প্লাক্সা' (ছিঁচকাঁদুনী)-র সঙ্গে একই খোঁয়াড়ে। সেখানে শীতকালে বাচ্চা হল প্লাক্সার — তিনটি ভল্লুক-শিশু। বাচ্চাদের দিকে খুবই আক্রোশে চাইলে বরেৎস্, বার কয়েক চুপিচুপি এগুবারও চেষ্টা করেছে। কিন্তু মা ছিল খুবই সজাগ। বাপ একটু কাছে ঘেঁষতে গেলেই প্লাক্সা এগিয়ে গিয়ে তার দেহ দিয়ে আড়াল করত তখনো চোখ-না ফোটা বাচ্চাদের। চেহারায় বরেৎস্ ছিল প্লাক্সার দ্বিগুণ, গায়েও তার জোর অনেক। কিন্তু রাগ হলে ভল্লুকী-মা ভয়ঙ্করী। প্রচণ্ড আক্রোশে সে ঝাঁপিয়ে পড়ত বরেৎসের ওপর, এমন ঘা মারত যে বরেৎস্
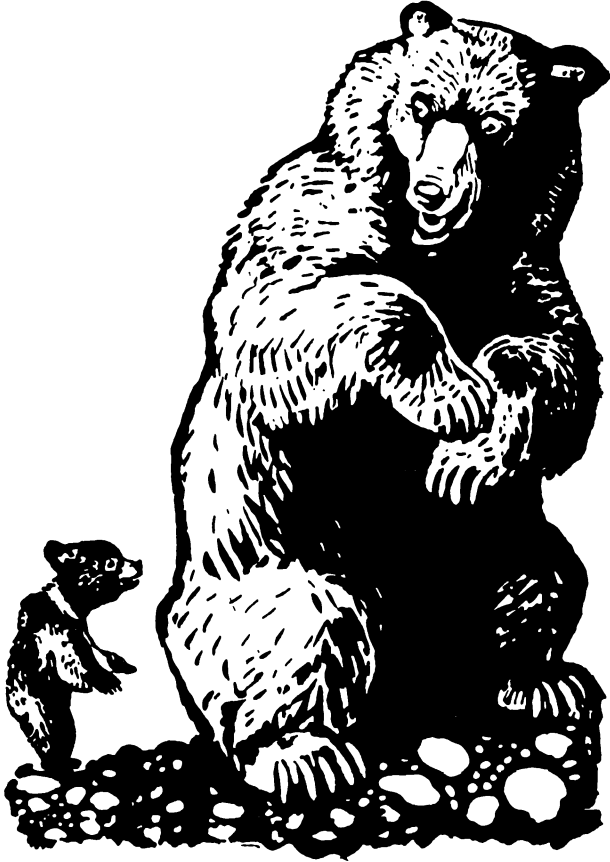
সঙ্গে সঙ্গেই হটে যেত। ভল্লুকীর চপেটাঘাত থেকে বাঁচত সে পিছিয়ে গিয়ে সামনের থাবা দিয়ে মাথা ঢেকে। একবার তো মারমুখী ভল্লুকীর কাছ থেকে পিছতে গিয়ে পরিখাতেই পড়ে যায় সে।

'সাংসারিক এই তুলকালাম' চলে দিনের পর দিন, শেষে বরেৎস্ মেনে নেয় কাছে-পিঠে শিশু-ভালুকদের সহ্য করা প্রয়োজন। প্লাক্সা তাকে এমনই ভয় পাইয়ে দিয়েছিল যে তার মধ্যে একটা বিশেষ প্রতিবর্ত দেখা দিল: গুহা থেকে বেরিয়ে বাচ্চারা কখনো বাপের কাছাকাছি হলেই সে পড়ি-মরি দৌড় দিত, খাণ্ডারী মায়ের দিকে সশঙ্কে তাকিয়ে বড়ো বড়ো থাবায় বাঁচাত আগে থেকেই।

আমাদের মনে হয়েছিল, বরেৎস্ বোধ হয় তার এই নতুন সাংসারিক অবস্থাটা মেনে নিয়েছে চূড়ান্তভাবেই। কিন্তু সেটা হয় নি।

খোঁয়াড়ের মাঝখানে, ভালুক পরিবারটি যেখানে থাকত, সেখানে ছিল বেশ উঁচু-মতো একটা কাঠের গুঁড়ি। দু'জন মানুষেও বেড় পাবে না, এত মোটা। একদিন তার ওপর উঠে রোদ পোয়াচ্ছিল একটা বাচ্চা। প্লাক্সা ঢুলছিল। বরেৎস্ চুপিচুপি গুঁড়িটার কাছে গিয়ে এমন জোরে থাবা মারে যে বাচ্চাটা চিৎকার করে ছিটকে যায় কয়েক মিটার পর্যন্ত। তক্ষুনি জেগে ওঠে ভল্লুকী। বাপ-ভল্লুককে গোটা দুই উত্তম-মধ্যম দিতেই সে শান্ত হয়ে আসে, দোষীর মতো ভাব করে চলে যায় কোণটিতে ঘুমাতে।

দিন কয়েক সংসারে শান্তি রইল। নিজের স্বাভাবিক সতর্কতায় ঢিল পড়তে লাগল প্লাক্সার। শান্ত রোদের এক সকালে সে ফের আগের মতোই ঢুলছিল। সেই ফাঁকে একটা বাচ্চা পরিখায় নেমে জলে থাবা ধুতে শুরু করে। বরেৎস্ মন দিয়ে তাকে লক্ষ্য করে, তারপর চুপিচুপি অন্য পাশ দিয়ে নেমে আস্তে আস্তে এগুতে থাকে বাচ্চাটার দিকে। বিপদ টের না পেয়ে বাচ্চাটা মনের আনন্দে জল ছিটিয়েই চলেছে। হঠাৎ বরেৎস্ দাঁত দিয়ে তার গলা কামড়ে চট করে তাকে জলের ভেতরে ঠেসে ধরে। চেঁচাবার চেষ্টা করে বাচ্চাটা, পারে না: হাবুডুবু খেতে থাকে। কিন্তু বরেৎসেরও দম ফুরিয়ে এসেছিল, নিঃশ্বাস নেবার জন্যে এক মুহূর্ত জল থেকে মাথা তুলতে বাধ্য হল সে, অবিশ্যি দাঁত থেকে শিকারকে সে তখনো ছাড়ে নি। ঠিক সেই সময় 'পশুদ্বীপে' (মস্কো চিড়িয়াখানার নতুন এলাকার যে অংশে ভালুক থাকে) শোনা

গেল ভালুক-ছানার পরিত্রাহি আর্তনাদ। তন্দ্রা ছুটে গেল মায়ের। দুই লাফে বড়ো আঙিনাটা পেরিয়ে সে মুহূর্তের মধ্যে হাজির হল বিশ্বাসঘাতক বাপের কাছে।

তারপর সে যা কাণ্ড! ক্ষিপ্তের মতো প্লাক্সা ঝাঁপিয়ে পড়ল বরেৎসের ওপর, দম নিতেও দিলে না তাকে। ভয়ঙ্কর মার খেয়ে ভালুকটা কেবল থাবা দিয়ে গা বাঁচিয়ে একরাশ জল ছিটিয়ে পিছিয়ে গেল পরিখার দূর কোণে। ভয় পেয়ে সে ওখানেই বসে ছিল ঘণ্টাখানেকেরও বেশি। আর শঙ্কিতের মতো কেবলি কান পেতে শুনছিল ওপরে তার উত্তেজিতা মাদীর পায়ের শব্দ।

সেই থেকে ভল্লুক পরিবারের রেওয়াজ হয়ে গেল পাকা। বাচ্চাদের খাওয়ানো আর বড়ো করে তোলায় ব্যস্ত প্লাক্সা বরেৎসের দিকে ভ্রূক্ষেপও করত না।

বরেৎসের লোম পালটাতে লাগল, বংশধরদের নিয়ে তার আর কোনো আগ্রহ রইল না। এখন চিত হয়ে শুয়ে দু'পাশে থাবা ছড়িয়ে প্রায়ই সে ঘুমোয়।

অলক্ষ্যে এগিয়ে এল শীত। ভালুকরা গভীর গর্ত খুঁড়লে, বেশির ভাগ সময়টা তারা সেখানে কাটাত তন্দ্রার মধ্যে। প্লাক্সা ঘুমোত তার তিন বাচ্চা নিয়ে, আর বরেৎস্ থাকত খোঁয়াড়ের উল্টো দিকে ভিন্ন একটা গুহায়। দিনটা গরম থাকলে বাচ্চাগুলো গর্ত থেকে বেরিয়ে খেলা করত বরফে। কখনো কখনো তারা নির্ভয়ে এগিয়ে যেত বাপের দিকে, বরেৎস্ তখন চেষ্টা করত গুহায় মায়ের কাছে পালাবার পথটা তাদের আটকাতে। শীতে প্লাক্সার মাতৃস্নেহ কমে যায়, সে তার 'বাঁকা-থাবা' ছানাদের রক্ষা করত কেবল যখন তারা থাকত গুহায়। তবে নাবালকরাও তদ্দিনে অনেক স্বাধীন হয়ে উঠেছে, এখন তাদের ধরা অনেক কঠিন। তাহলেও একটা ভালুক-ছানাকে ধরতে পারে বরেৎস্। একমনী বাচ্চাটাকে বাপ এমন মারে যে সে ছিটকে পরে কয়েক মিটার দূরে।

বসন্তে ভল্লুক পরিবারে গুরুতর কোনো অশান্তি দেখা যায় নি। বেশ বড়ো হয়ে উঠল ছানাগুলো, বাপকে এখন আর বিশেষ ভয় পায় না।

একদিন চিড়িয়াখানা দিয়ে যাবার সময় দেখি, ভালুক পরিবারের খোঁয়াড়ের কাছে যেসব দর্শক জড়ো হয়েছে, তারা কলরব করে তাদের উল্লাস প্রকাশ করছে। খোঁয়াড়ে সে সময় সত্যিই একটা মজার নাটক হয়ে গেছে। বরেৎস্ পরিখায় নেমেছিল

ওদিকে কিছুদিন আগে যে ছানাটা চপেটাঘাত খেয়েছিল সে ওপর থেকে নজর রাখে তার ওপর। পরিখা থেকে দেয়ালে ওঠার চেষ্টা করছিল ভালুকটা। পেছনের পায়ে খাড়া হয়ে সে নখ দিয়ে দেয়াল আঁকড়ে নিজেকে তুলতে চাইলি। এই সময় ভালুক ছানাটি এসে বাপকে তিনটি চড় কষে পড়ি-মরি ছুটে পালায় মায়ের আশ্রয়ে...
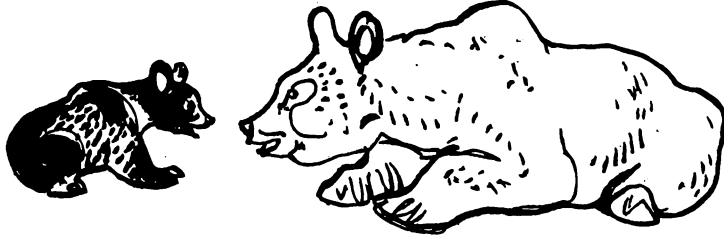
ট্রেনিং না নিলে

মস্কো চিড়িয়াখানার কিছু পোষ্য — তিতির, খরগোস, গাইয়ে পাখি — এরা তাদের শৈশব কাটিয়েছে ছোটো ছোটো খাঁচায় বসে। কীভাবে ওরা বাড়ছে সেদিকে অবিরাম নজর রাখতাম আমরা। মনে হল তাদের বাড়ে শঙ্কার কিছু নেই। স্বাভাবিকভাবেই বড়ো হচ্ছে, দানাপানি পাচ্ছে চমৎকার, শুধু খাঁচার আয়তন অনুসারে এদের গতিবিধি সীমাবদ্ধ।

ক্রমে ক্রমে বাচ্চারা বড়ো হল, যে পরীক্ষাটা শুরু করেছিলাম সেটা শেষ করব ঠিক করলাম। পশুদের বিকাশের ওপর খাঁচার আয়তনের প্রভাব কী, তাই নিয়ে পরীক্ষাটা। শুরু হল খরগোস দিয়ে। বেড়ে উঠেছিল সে ছোট্ট সংকীর্ণ এক খাঁচায়। সেখান থেকে তাকে ছেড়ে দেওয়া হল একটা বিস্তীর্ণ ঘাস-জমিতে। বসে তাকিয়ে দেখতে লাগল খরগোসটা। চোখ ধাঁধানো রোদ। এখানে-ওখানে রঙচঙে ফুল, জ্বলজ্বলে গালিচায় ঢাকা জমি। চারিপাশেই একটা অনভ্যস্ত বিস্তার। খরগোসটা একটা চড়া লাফ দিলে, তারপর আরো, আরো। প্রতি মুহূর্তেই যেন সে উদ্দাম হয়ে উঠছে। তারপর ফের পেছনের পায়ে ভর দিয়ে লাফিয়ে উঠল শূন্যে — এবং পড়ল নিশ্চল হয়ে। কাছে এগিয়ে গেলাম। কী ব্যাপার? মরে গেছে খরগোসটা। লাস কেটে বোঝা গেল — হার্টের আকস্মিক পক্ষাঘাতে মৃত্যু।

ছোট্টো একটা খাঁচায় বেড়ে উঠেছিল তিতির পাখি। সারা জীবনেও কখনো সে ওড়ে নি, তার ডেরাটা ছিল বড়োই সংকীর্ণ।

একানব্বই দিনের দিন তার লেজে পেখম গজাল, হয়ে উঠল সে কালচে রঙের এক বাহারে পাখি, বয়স্ক তিতিরদের সঙ্গে তার কোনোই তফাৎ নেই রঙে। বসন্তে তাকে ছাড়া হল বড়ো একটা জায়গায়, মাদী তিতিররা থাকত সেখানে। খোলা-মেলায় সেই তার প্রথম ও শেষ দিন। মুক্ত বন্দী তার লেজ মেলে ডেকে উঠল, বকবকম করে গাইলে তার বিয়ের গান। ঘুরপাক খেলে সঙ্গমের সময়ের মতো, তারপর হঠাৎ চিৎপাত হয়ে পড়ল, কয়েকবার খিঁচুনি খেয়ে নিথর হয়ে গেল। ডাক্তারী তদন্তে দেখা গেল মৃত্যু হয়েছে মহাধমনী ফেটে গিয়ে।

এইভাবেই মারা যায় ছোটো খাঁচায় বেড়ে ওঠা নাইটিঙ্গেল। চড়া গলায় প্রথম ডেকে উঠতেই সে ডাল থেকে পড়ে যায় মরা। প্রচণ্ড রক্তস্রাব শুরু হয় তার।

এসব পরীক্ষা থেকে কী বোঝা গেল?

বোঝা গেল এই যে প্রাণীদের মুক্ত জীবনের ওড়া, লাফ-ঝাঁপ এবং অন্যান্য দেহচর্চা না থাকায় তাদের ভেতরের প্রত্যঙ্গ যথেষ্ট তালিম পায় না। হার্ট আর ধমনীর গা হয় না মজবুত, স্থিতিস্থাপকতা তাদের কম, বর্ধিত রক্তের চাপ সইতে পারে না। এমনকি সদ্য বাসা ছেড়ে উড়ে যাওয়া বাচ্চা পাখিও অনেক সময় মারা পড়ে হার্টের শক ও আভ্যন্তরীণ রক্তস্রাবে। সাধারণত সেটা ঘটে বাজ বা অন্য কোনো শিকারী পাখি থেকে আত্মরক্ষার সময়। একবার শুনেছিলাম, বাজপাখির তাড়া খেয়ে একঝাঁক স্টার্লিং থেকে অল্পবয়সী কয়েকটা পাখি পড়ে গিয়েছিল মাঠে। শিকারীর আচমকা গুলির শব্দে চকে গিয়ে দ্রুত ডানা নেড়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা করতে গিয়ে তরুণ মরাল মরে পড়েছে, এমন ঘটনাও কম নেই।

'স্থিতু জীবনে' সবচেয়ে কষ্ট শশকের। শোনিতবাহী ব্যবস্থার কার্যক্ষমতার তুলনায় তার পেছনের পায়ের পেশী হয় অনেক শক্তিশালী, ছুটে খাবার খেতে যাবার সুযোগ পেলে তাদের বেমজবুত হাড় প্রায়ই ভেঙে যায়। এমনকি সাবালক খরগোসও ২২—২৫ দিন সংকীর্ণ খাঁচায় থাকার পর দৌড়তে গিয়ে তাদের কয়েকটার পেছনের পায়ের হাড় ভেঙেছে; এটা দেখা গেছে সাইবেরিয়ার খরগোসদের ছেড়ে দিয়ে।

ঠিক তিতির, নাইটিঙ্গেল, খরগোসের মতোই চিড়িয়াখানায় মারা যায় দুটো বাদামী ভালুক। প্রথমে তারা ছিল খুব ছোটো জায়গায়, সেখান থেকে তাদের জোর

করে নিয়ে আসা হয় নতুন একটা বড়োসড়ো খাঁচায়। গতির অনভ্যস্ত প্রখরতায় তাদের রক্তের চাপ খুব বাড়ে, আভ্যন্তরীণ রক্তস্রাবে মারা যায় তারা।

একবার শিকারীর কাছ থেকে সদ্য পাওয়া একটা শাদা খরগোস খোলা খোঁয়াড় থেকে বেরিয়ে যায়। পরিখাটা লাফিয়ে পেরিয়ে গিয়ে সে পেঁছিয় বাদামী ভালুক বরেৎসের খোঁয়াড়ে। লাফাতে লাফাতে ভালুকটা পেছু নেয় খরগোসের, কিন্তু আশ্চর্য চাতুর্যে খরগোস তাকে এড়িয়ে এড়িয়ে যায়; বরেৎস্ কিছুতেই তাকে ধরতে পারে না। অনুসরকের হাত ফসকে ক্ষিপ্র খরগোস দু'মিটার লম্বা ঝাঁপ দিয়ে পাশের দেয়ালের কুলুঙ্গিতে পাথরের সঙ্গে সেঁটে থাকে ভালুকের নজর এড়িয়ে। সমস্ত আড়াল-আবডাল দেখল ভালুকটা, তারপর পেছনের পায়ে খাড়া হয়ে গন্ধ শুঁকতে লাগল। মিনিটখানেক শুঁকেই সে মন দিয়ে লক্ষ্য করতে লাগল দেয়ালের এবড়ো-খেবড়ো জায়গাগুলো, তারপর শেষ পর্যন্ত গন্ধে গন্ধে বার করে ফেললে। ঝাঁকড়া অনুসরক সন্তর্পণে সামনের দুই থাবা প্রসারিত করে গেল দেয়ালের কাছে, কিন্তু খরগোসটা আচমকা লাফ দিল ভালুকের মাথার ওপর দিয়ে। বরেৎস্ তাকে ধরতে গিয়ে ভারসাম্য হারিয়ে চিৎপাত হয়ে পড়ে। অনুসরণ চলেছিল এর পরেও। আরো ঘণ্টা দুয়েক ভালুকটা খোঁয়াড় ঢুঁড়ে বেড়ায়, এক কোণায় ক্ষিপ্র দৌড়বাজটিকে সে থাবার ঘায়ে মারতে পারে কেবল দৈবাৎ।

এই ছোটাছুটির দরুন দশাসই জানোয়ারটাকে খেসারত দিতে হয় কম নয়: অনভ্যাসের ফলে এমন সে জেরবার হয়ে যায় যে দু'দিন ধরে কিছু মুখে তোলে না, চিৎ হয়ে শুয়ে থাকত, একটু নড়তে-চড়তে গেলেই ককাত। বছরের পর বছর চিড়িয়াখানায় থাকায় বড়ো রকমের চাপ সহ্য করতে তার পেশী অনভ্যস্ত।
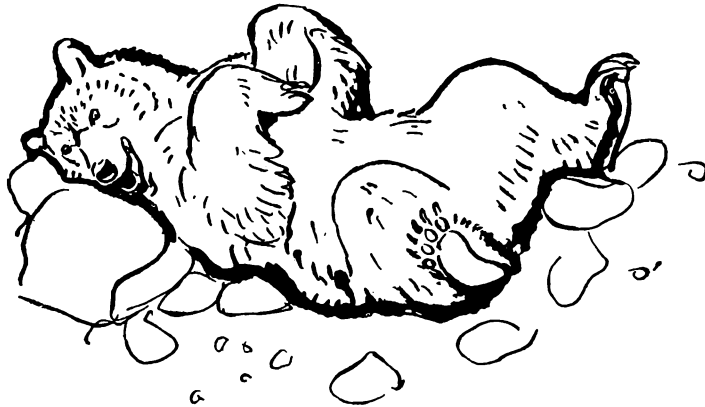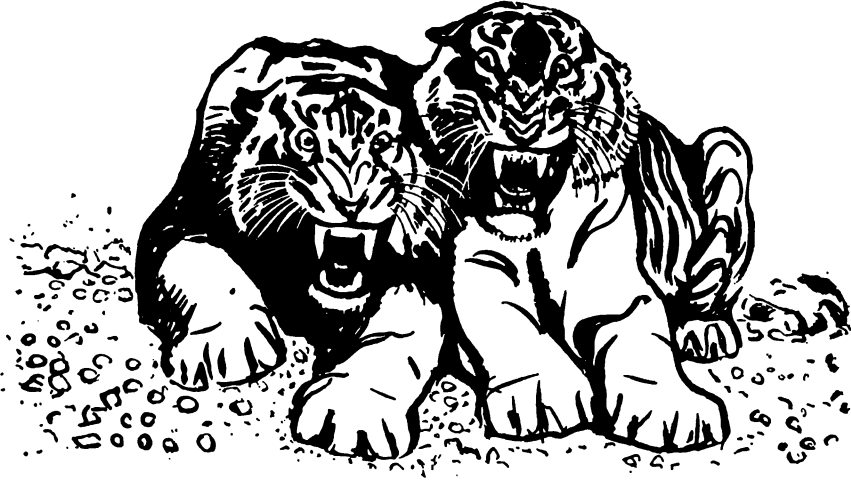
সাহসী আর ভীরু

পশুদের সম্পর্কে চলতি প্রবচন ও কাহিনী থেকে আমাদের অনেকের ধারণা যে বাঘ-সিংহ খুব সাহসী, গাধারা বোকা, শুয়োর বড়ো নোংরা, খরগোসেরা ভীরু। কিন্তু প্রচলিত এই মতগুলো সর্বদাই সঠিক, মোটেই এমন নয়।

মস্কো চিড়িয়াখানার নতুন এলাকাটায় খুব ছোট্ট একটা ছাগল-ছানা কেমন করে যেন গিয়ে পড়ে উসুরি বাঘেদের খোঁয়াড়ে। প্রকান্ড এই জানোয়ারগুলো আগে কখনো ছাগল-ছানা দেখে নি। নির্ভয়ে ছানাটা তাদের দিকে এগিয়ে আসছে দেখে তারা আত্মরক্ষার ভঙ্গি নেয়। ছাগল-ছানাটা কিন্তু মায়ের খোঁজে নিশ্চিন্তে এগিয়ে যায় তাদের দিকে। ওরা কিন্তু গর্জে, দাঁত বার করে সরে সরে যায় ছানাটার কাছ থেকে। দেয়ালের সঙ্গে সেঁটে পেছনের পায়ে ভর দিয়ে, চোখ কুঁচকে, আতঙ্কে গর্জন করে এই ডোরাকাটা শ্বাপদগুলো থাবা দিয়ে ছানাটাকে তাড়াতে শুরু করে। তাদের একটা দৈবাৎ আঘাতে মারা যায় ছানাটা।

কিন্তু এর পরেও বাঘগুলো অনেকখন ভয়ে ভয়ে ঘোরাফেরা করে, শোঁকে, ছোট্ট নিষ্প্রাণ দেহটার কাছে যেতে সাহস পায় না। উচ্চপ্রশংসিত বাঘের সাহস এই রকমও হয়! অথচ রোজ সকালে চিড়িয়াখানায় ঘোড়ায় টানা গাড়িতে যখন জন্তুদের খাবার দেওয়া হয়, তখন কান নামিয়ে বাঘেরা গুড়ি মেরে এগোয় ঘোড়ার দিকে,

ঝাঁপ দেবার উপক্রম করে থমকে যায় একেবারে পরিখার কাছে, ওটা লাফিয়ে যাওয়ার সাধ্যি তাদের নেই।

চিড়িয়াখানায় এসে অনেকে দেখে অবাক হয়েছে যে এখানকার অ্যাকোয়ারিয়মে ক্ষিপ্র পাইক মাছের পাশেই নির্ভয়ে সাঁতরাচ্ছে সোনালী রঙের ছোটো ছোটো মাছ। কিন্তু আসলে ওটা ছোটো মাছটার সাহসের ব্যাপার নয়। খোলা জলে দাঁতালো পাইক খায় সাধারণত রুপোলী আঁশের মাছ, সোনালী মাছে সে অনভ্যস্ত, তাই বহুদিন তাকে ছোঁয় না। পুকুরের জলের কার্পের ওপরেও নদীর জলের পাইক আক্রমণ করে অতি কদাচিৎ, নদীর ছুটন্ত জলে এ রকম মাছ সে দেখে নি। এবং প্রবচনে যাই বলুক, এ কার্প নিশ্চিন্তে নিদ্রা দিতে পারে পাইকের পাশেই।

মস্কো চিড়িয়াখানার বিরাট আট মিটার লম্বা জালি-আঁকা পাইথন সাপটাকে সাধারণত খেতে দেওয়া হয় শাদা শুয়োরের বাচ্চা; বন্দী অবস্থায় এই রঙটায় সে অভ্যস্ত হয়ে গেছে বহুদিন। এ রকম ছানা পেলে সে তার দেহের প্রচণ্ড পাকে সঙ্গে সঙ্গেই তার নিঃশ্বাস বন্ধ করে মেরে ফেলে, তারপর নাকটা থেকে শুরু করে গোটাগুটি তাকে গিলে খায়। কিন্তু প্রকাণ্ড এই সাপটার খোপে যদি দেওয়া যায় ছোপ-ছোপ রঙের শুয়োর-ছানা, তাহলে তাকে সে ছোঁয় না শুধু নয়, নিজেই কুণ্ডলী পাকিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষার ভঙ্গি নেয়।

একবার ল্যাপ্‌ল্যাণ্ডের এক সংরক্ষিত ঘন বনে হঠাৎ ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে একটা বাদামী ভালুক আক্রমণ করে শিকারবিদ গ. গ. শুবিনকে। সদ্য একটা এল্‌ক্‌ হরিণ মেরেছিল ভালুকটা, সেটা রক্ষার জন্যে সে শুবিনকে স্কি থেকে চিৎপাত করে ফেলে দাঁত দিয়ে জোরে তার পা কামড়ে ধরে। শুয়ে শুয়েই শুবিন ট্রিগার ঠিক করে নিয়ে গুলি চালায়, কিন্তু মিসফায়ার করে সেটা। তাহলেও ভালুকটা তক্ষুনি লাফিয়ে সরে যায়। ট্রিগার চালাবার অনভ্যস্ত ধাতব খট্‌ শব্দটায় ভয় পেয়ে যায় সে। বাঁ নলের গুলিতে গুরুতর জখম হয়ে সে উধাও হয়ে যায় তাড়াতাড়ি।

আফ্রিকায় সিনেমা-অভিযানে যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁরা সিংহের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাতের গল্প বলেছেন। সিংহ যে মাঠে আছে, বাতাস যদি সেখান থেকে বইত এগিয়ে আসা অভিযাত্রী মোটরের দিকে, তাহলে সিংহ মানুষকে আসতে দিত তার অনেক কাছাকাছি। কিন্তু বাতাসের দিক বদলালেই সিংহ মানুষের গন্ধ পেয়ে চম্পট দিত। এ থেকে এই

ব্যাপারটা সমর্থিত হয় যে আরো অনেক জন্তুর মতো সিংহও চোখে দেখার চেয়ে গন্ধ শুঁকে আন্দাজ করে বেশি।

এবার যাকে নিয়ে প্রবচন গড়ে উঠেছে সেই গাধা। সত্যিই কি সে অত হাঁদা? যে ঘটনাটা এখন বলব তাতে ও ব্যাপারে সন্দেহ জাগবে।

মশা, ডাঁশ প্রভৃতি রক্তচোষারা জ্বালালে অধিকাংশ গৃহপালিত পশুর মতো গাধাও লেজ নাড়ে, গা ঝাড়া দেয়। একবার মধ্য এশিয়ায় দেখি, কুকুরের একটা রক্তচোষা-মাছি নিয়ে একটা ফক্কড় ছেলে সেটাকে বসিয়ে দিলে গাধার গায়ে। লোমের ওপর এই এঁটুলির মতো কীটটার অস্তিত্ব টের পেয়ে গাধাটা গড়াগড়ি দিতে লাগল মাটিতে, জ্বালিয়ে-মারা শক্ত চ্যাপ্টা মাছিটাকে সে যেন তাতে করে পিষে ফেলতে চাইছিল। ছেলেটা কিন্তু ক্ষান্ত হল না, আরেকটা অমনি মাছি খুঁজে নিয়ে সেটাকে ফের গাধার পিঠে বসাবার জন্যে চুপিচুপি এগুতে লাগল সে। কটাক্ষে মাছিটার দিকে তাকিয়ে গাধাটা দ্রুত ছুটে আসে এবং পেছনের পায়ের খুর দিয়ে চাঁট মেরে পাজিটাকে নালার গর্তে ফেলে দেয়। নির্বুদ্ধিতা থেকে এমন মহড়া নেওয়া যায় না!

প্রবচনে বলে 'খরগোসের মতো ভীরু'। অথচ খরগোস কিন্তু বরং সাহসীই। অনেকেই বোঝেন না যে অস্তিত্বের সংগ্রামে দ্রুতগতি খরগোসকে বাঁচায় তার পা। অত জোরে ছুটতে না পারলে নানান হিংস্র পশু তাকে শেষ করে দিত অনেক আগেই। খরগোসের দ্রুত গতি হল তার আত্মরক্ষার প্রধান উপায়। যাকে বলা হয় পড়ি-মরি দৌড়, সেভাবে খরগোস কখনো ছোটে না। রেকর্ড গতিবেগ সে দেখায় কেবল চূড়ান্ত ক্ষেত্রে, সাধারণত নিজের শক্তি বাঁচিয়ে চলে। যেসব শিকারী কুকুর খুব জোরে দৌড়তে পারে না, তাদের কাছ থেকে খরগোস পালায় তাড়াহুড়ো না করে, পাশ ফিরে ফিরে লক্ষ্য করে কুকুরকে। কিন্তু রুশী উল্‌ফ্‌-হাউন্ডে তাড়া করলে অন্য ব্যাপার। এদের দৌড়ের ক্ষিপ্রতা খরগোসের সমান বা বেশি। সেক্ষেত্রে খরগোস চূড়ান্ত গতি বাড়ায়, কুকুরের হাত এড়াবার পরেও ছুটে যায় আরো দু'-তিন কিলোমিটার। এটা ভীরুতা নয়, শত্রুর হাত থেকে বাঁচার অন্য কোনো উপায় নেই তার।

আস্কানিয়া-নোভা সংরক্ষিত বনাঞ্চলে একবার দেখেছিলাম, অল্পবয়সী একটা ঘোড়া মাথা নিচু করে শুঁকতে শুঁকতে যাচ্ছিল স্তেপ দিয়ে। হঠাৎ তার নাকের কাছেই রেগে লাফিয়ে উঠল একটা খরগোস, সামনের পায়ের নখ দিয়ে তাকে আঁচড়ে দিলে। লাফিয়ে সরে গেল ঘোড়াটা, খরগোস তার আগের জায়গাতেই রয়ে গেল। আরেকবার

দেখেছিলাম, কুকুরদের তাড়া থেকে পালিয়ে তিনটে খরগোস নির্ভয়ে ভেড়ার পালের মধ্যে ঢুকে গিয়ে আত্মরক্ষা করল।

তবে কুকুরের কাছ থেকে খরগোস সব সময়ই পালায়, এমন নয়। শীতের চাঁদিনী রাতে মাঝে মাঝে দেখা যায় সব্জী-বাগানে নিশ্চিন্তে বাঁধাকপির গোড়া চিবুচ্ছে খরগোস, শেকলে বাঁধা কুকুরের ডাকে তার কিছু এসে যাচ্ছে না, অথচ দিনের বেলায় এই কুকুরটাই একরোখার মতো তাড়া করেছিল তাকে।

আহত খরগোসকে অসাবধানে কান ধরে তুলতে গিয়ে তার থাবার জোর টের পেতে হয়েছে একাধিক শিকারীকে; পেছনের পায়ের ধারালো নখে শিকারীর গায়ে গুরুতর ক্ষত করেছে কম নয়।

খরগোস যখন নিজের প্রাণ বাঁচাতে যায়, তখন তার সঙ্গে লড়াইয়ে শিকারী পাখি মারা পড়েছে অনেক। ঈগল পাখির আক্রমণ ঠেকাতে গিয়ে খরগোসকে মাটিতে শুয়ে পড়ে পেছনের জোরালো থাবার নখ দিয়ে বিশাল হিংস্র পাখির নাড়ি-ভুঁড়ি বার করে দিতে দেখেছে কিছু কিছু শিকারী।

নিশ্চয় কিছু কিছু পর্যবেক্ষকের চোখে পড়েছে কিভাবে কোনো কোনো কুকুর সন্তর্পণে এড়িয়ে চলে মুরগীকে। তার অর্থ, ছেলেবেলায় কোনো সময় ছানা-পোনা রক্ষায় ক্ষিপ্ত মুরগীর ঠোকর খেতে হয়েছিল সে কুকুরকে। যত আশ্চর্যই লাগুক, এমনকি মুরগীও একটা শক্তিশালী বড়ো জানোয়ারের মনে ভয় ঢুকিয়ে দিতে পারে চিরকালের জন্যে।

আমাদের দক্ষিণ-স্তেপবাসী কামেনকা নামের ছোটো ছোটো ফুর্তিবাজ নাচুনী পাখিগুলোর ব্যাপারটাও কম মজার নয়। কামেনকারা বাসা পাতে সুস্লিক মূষিকদের পুরনো পরিত্যক্ত বিবরে। বড়ো হয়ে ওঠা সুস্লিকরা নিজেদের মা-বাপের বাসা ছেড়ে এসে প্রায়ই এইসব পুরনো বিবর দখল করতে চায়। সংঘাত বাধে তখন। সুস্লিক কিন্তু তার বাসার কাছে ঘেঁষলে ছোট্ট এই পাখিটা নির্ভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুর ওপর, এমনকি তার পিঠে উঠে, কান কামড়ে ধরে, পিঠে চেপে ঘোরে স্তেপ এলাকা। এই রকম বার কয়েকটা সংঘাতের পর গর্তের কাছে কামেনকা দেখলে তরুণ সুস্লিক আর সেদিকে যায় না।

আফ্রিকার উটপাখিদের কথাও একটু বলা যাক। এদের সম্বন্ধে গল্প আছে যে ভয়ে তারা বালিতে মুখ গুঁজে থাকে। শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় বিশাল এই পাখিটা হয়ে ওঠে ভয়ঙ্কর। উটপাখির পায়ের লাথি ঘোড়ার খুরের চাঁটের চেয়েও

জোরালো। কিন্তু একটা লাঠির ডগায় টুপিটা উ‘চু করে তুললেই সে পিছিয়ে যাবে। উটপাখি কেবল তাদেরই আক্রমণ করে যারা লম্বায় তার চেয়ে খাটো।

কিছু কিছু জন্তুর ভিত্তিহীন খ্যাতি-অখ্যাতির এ কাহিনী শেষ হবে না যদি ‘নোংরা’ শুয়োরের কথা না বলি। একান্ত সঙ্গত কারণেই আমরা বলতে পারি যে শুয়োর অতি পরিচ্ছন্নতাপ্রিয় জীব। যেসব রাষ্ট্রীয় ও যৌথ খামারে শুয়োরের জন্যে ভালো যত্নের ব্যবস্থা আছে, সেখানে তারা নিজেদের থাকার জায়গাটি বেশ গুছিয়ে রাখে, অবশ্য-অবশ্যই মলমূত্র ত্যাগের জায়গাটা করে দূরের একটা আড়ালে। গরম লাগলে শুয়োর চান করে নিতে চায়, আর পথে স্নানঘরের বদলে জল-কাদা থাকলে তাদের আর দোষ কী?

জন্তুদের বন্ধুত্ব

মস্কোর চিড়িয়াখানায় মস্তো একটা ঘের দেওয়া জমিতে একসঙ্গে থাকত একদল পাঁচমিশালী জানোয়ার। বেশ অসাধারণ দলটা; দুটি নেকড়ে, একটা বাদামী ভালুক, তিনটে ব্যাজার, ছয়টি উসুরী র‍্যাকুন এবং সমানসংখ্যক শেয়াল।

শৈশবেই তাদের রাখা হয় একসঙ্গে।

'করছেন কী?' বলেছিল কোনো দর্শক। 'ওরা বড়ো হয়ে উঠলে প্রবলের হাতে দুর্বল অবশ্যই মারা পড়বে। প্রকৃতিতে যা হয় তা হবেই!'
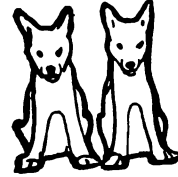
দু'বছর কাটল। বড়ো হয়ে উঠল জন্তুগুলো। 'প্রকৃতিতে যা হয় তা হল না।' দলটার কেউ কাউকে ভয় পেত না, শুধু ফেরগানা স্তেপের লালচে-বাদামী নেকড়েটা ছাড়া, সবারই 'তোয়াজ করে' সে। বড়োসড়ো শক্ত-সমর্থ চেহারা হলেও নেকড়েটা সর্বদাই ভয়ে ভয়ে এদিক-ওদিক চাইত, এমনকি ছোট্ট শেয়ালদেরও সৌজন্য দেখিয়ে রাস্তা ছেড়ে দিত। অন্য জন্তুরাও বিশেষ পছন্দ করত না এই পা-চাটাকে।
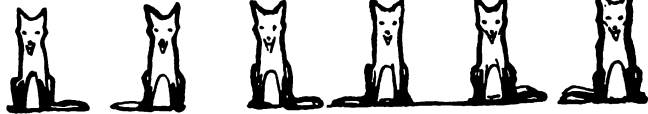
কী একটা নীরব চুক্তিতে দিক্‌তা নামের এক কড়া ও 'কর্তৃত্বময়ী'

মাদী নেকড়েকে মেনে চলত সবাই। তবে তার কাজ তেমন বেশি ছিল না। খাবার সবাই পেত অবশ্য-অবশ্যই একই রকম এবং একসঙ্গে সে সময়টাও সব ভালোই উৎরাত। খাবার জায়গায় দিক্‌তা তার দাঁত বার করত মাঝে মাঝে, একগুঁয়ে ভালুক মিশ্‌কা তখন পিছিয়ে যেত। মাঝে মাঝে হত কী, লোভী শেয়ালগুলো দখল করে নিত বড়ো বড়ো টুকরোগুলো, নেকড়েরা তখন নাক দিয়ে তা খসিয়ে দিত তাদের দাঁত থেকে।

সবচেয়ে স্বাধীনভাবে চলত ব্যাজাররা। এমনকি ভালুকের সঙ্গেও ছিল তাদের দহরম-মহরম।

ঝগড়া হত খুব কম, হলেও চট করেই তা মিটে যেত; কেননা অমনি জায়গা ছেড়ে উঠত দিক্‌তা, ঝগড়ুটেদের ভাগিয়ে দিত এদিক-ওদিক।

উত্তেজনার ভক্তরা বৃথাই ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেছে, একটা মারপিট লাগবে নাকি? 'নানা জাতের' অধিবাসীদের এই এলাকাটায় 'সামরিক পরিস্থিতি' ঘোষিত হয় নি কখনো। অসাধারণ এই সহবসতির নিয়ম-কানুনের পেছনকার কারণটা এই যে এরা ছোটো থেকেই পরস্পর অভ্যস্ত হয়ে যায়, এদের কামড় যখন বিপজ্জনক নয়, সেই শৈশব থেকেই কতকগুলি সাপেক্ষ প্রতিবর্ত গড়ে উঠেছে এদের মধ্যে, তাতে নিজেদের মধ্যে সম্পর্কে যে সীমাটা পেরলে গুরুতর কলহ দেখা দিতে পারে, সেটা পেরনো যায় না। যেমন, নেকড়েদের সঙ্গে বেড়ে ওঠা শেয়াল নেকড়ের মাংসে লোভ করে না। কাছ দিয়ে যাবার সময় বরাবর চোখ ফিরিয়ে নেয়। কিন্তু সে নেকড়ে যখন খেয়ে দেয়ে ফিরে আসে বরফের মধ্যে, তখন শেয়াল তার গায়ে চেপে ঘুময়, যেন গরম সোফা।

জীবজন্তুদের একত্রে প্রতিপালনের এই পরীক্ষাটা থেকে পরিষ্কার দেখা যায় যে জীবজন্তুর আচরণ প্রভাবিত করে মানুষ তাদের সহসম্পর্ক খুবই বদলিয়ে দিতে পারে, প্রকৃতিতে যা দেখা যায় এমনকি তার একেবারে বিপরীত রকমে।

পরবাসীর পঞ্জিকা

দিব্যি সুন্দর শুকনো আবহাওয়া। চোখ ধাঁধানো রোদ্দুর, ছায়াচ্ছন্ন সবুজ তরুবীথি তলেও গরম। কিন্তু ভারত থেকে আনা মস্কো চিড়িয়াখানার বিশাল পাইথনটা ভাব করছে এমন যেন এখন শীতকাল। নড়াচড়া তার অনেক কমে গেল, সাপটার কাছে রাখা শুয়োর-ছানাটা পর্যন্ত সে ছুঁলে না। আগের মতোই সে পাথরের একটা খোঁচার তলে নিশ্চল হয়ে পড়ে রইল: এই সময় তার স্বদেশ ভারতে যে ঠান্ডা বৃষ্টি পড়ে, তা থেকে যেন আত্মরক্ষা করছিল সে।

আর শীতে, ধূসর তুষার-মেঘ যখন নেমে আসে নিচে, ফুলো ফুলো খইয়ের মতো পড়ে তুষার, তখন চিড়িয়াখানায় বাচ্চা দিতে শুরু করে অস্ট্রেলীয় উটপাখি এমু। গোটা চিড়িয়াখানাটা তুষারস্তূপে ঢাকা হলে কী হবে, এ সময় অস্ট্রেলিয়ায় যে পুরো বসন্ত!

অক্টোবর-নভেম্বরে বাচ্চা দিতে লাগল অন্য অস্ট্রেলীয় পাখি — কালো রাজহাঁস। তখন চিড়িয়াখানায় কোনো দর্শক এলে দেখতে পাবেন জল-গুল্ম দিয়ে খুঁটিয়ে বানানো বাসায় তুষারের পাউডার মেখে বসে আছে কৃষ্ণা-সুন্দরী। বাসায় তার পাঁচটি ডিম। পালা করে তাতে তা দিচ্ছে মন্দা আর মাদী।

অন্য অক্ষাংশ থেকে আনা কিছু কিছু জীবজন্তুর ক্ষেত্রে শীতকালে বাচ্চা দেবার মতো এই বিচিত্র ব্যাপারটা বংশগতভাবে চলে আসে, ওটা তাদের মজ্জাগত। আর চিড়িয়াখানার পরদেশী পোষ্যরা যখন আসার কয়েক বছর পরেও দিন কাটাতে থাকে তাদের স্বদেশের 'পঞ্জিকা' মেনে, তখন আমরা বলি: ওদের জৈবিক ছন্দ কাজ করছে, অর্থাৎ তাদের স্বাভাবিক পরিবেশে প্রাণধারণের যে পরিস্থিতি, তার প্রভাবে

যুগের পর যুগ ধরে নির্দিষ্ট প্রাণীগুলির মধ্যে যে জৈবিক বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছে, তার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে এক-একটা নির্দিষ্ট মেয়াদের পর।

মস্কো চিড়িয়াখানায় কৃষ্ণ মরালের এই বিদঘুটে আচরণের কারণ কী? স্বদেশে এসব পাখির প্রাণধারণের পক্ষে উপযোগী যেসব শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া আগেই স্বাভাবিক নির্বাচনে গড়ে ওঠে ও সংহত হয়, এটা তার বংশগত কালচক্র।

তবে এ কথা ভাবার কারণ নেই যে তার কিছুই বদলায় না। একবার, ১৯৩৬ সালে আমরা কৃষ্ণ মরালদের নিয়ে তেমন একটা পরীক্ষা করি। একেবারে বসন্ত না আসা পর্যন্ত আমরা তাদের বাসা বানাতে দিই নি, কেবলি তা ভেঙে দিতাম। বসন্তে ওদের আর জ্বালাই নি, তখন ডিম দেয় তারা।

পরে কালো রাজহাঁসের ছানারা যখন বড়ো হয়ে ওঠে, তখন তারা বাচ্চা দিতে শুরু করে বসন্তের কাছাকাছি।

নানা জাতের সংসার

একবার চিড়িয়াখানায় এল মেঠো বেড়ালের চোখ-না-ফোটা চারটে ক্ষুদে ক্ষুদে ছানা। এদের আমরা মানুষ করতে দিই ঘরে পোষা বেড়ালের কাছে, কিছুদিন আগে বাচ্চা হয়েছিল তার।

চিড়িয়াখানার কিশোর জীববিদরা জানত যে জন্তুরা দৃষ্টির চেয়ে গন্ধকে বিশ্বাস করে বেশি, তাই তারা জল-ভরা এক গামলায় বেড়াল-ছানাগুলোকে চুবায়, তারপর সেই জলেই চান করায় মেঠো বেড়ালের ছানাদের। আর সবকটাকেই একসঙ্গে দেয় বেড়ালের কোলে। বেড়ালটা প্রথমে ছটফটিয়ে ওঠে, কিন্তু একই জলে চান করায় মেঠো বেড়াল-ছানাগুলোর গা থেকেও ঘরোয়া বেড়ালের গন্ধ ছাড়ছিল, তাই পোষ্যদের সে টেনে নেয়, তাদের গা চাটে নিজের ছানাদের মতোই সমান যত্নে।

দিন গেল। বড়ো হয়ে উঠল মেঠো ছানারা, স্নেহময়ী সৎ-মায়ের নিয়ত তত্ত্বাবধানে ঘরোয়া ছানাদের সঙ্গেই খেলত তারা।

এইভাবেই চিড়িয়াখানায় দেখা দিল একেবারেই পোষা মেঠো বেড়াল। নিজেদের জায়গা ছেড়ে বেশি দূরে তারা যেত না কখনো, যদিও অচেনা লোক দেখলে সর্বদাই ফোঁস-ফোঁস করত, লুকিয়ে পড়ত কোথাও। কিন্তু অনেক কিশোর জীববিদের ডাকেই তারা মুহূর্তে ছুটে আসত, সোহাগ কাড়ত নিজেদের ধরনে। বেড়ালটা যদি ইঁদুর এনে আস্তে মিউ-মিউ করে তার পোষ্যদের 'খাবারে' ডাকত, তাহলে মেঠো ছানারাই ছুটে যেত সবার আগে, দখল করত খাবার।

একবার পোষা মেঠো বেড়ালেরা খেলা করছে, এমন সময় একটা শেয়াল তার খোঁয়াড় থেকে বেরিয়ে এসে তাদের দিকে এগুতে শুরু করে। ঠিক সময়ে যদি বেড়াল-মা তার পোষ্যদের না আগলাত, তাহলে এ শিকারের পরিণাম কী হত বলা যায় না। পিঠ বাঁকিয়ে প্রাণের মায়া না করে ভয়ঙ্কর চেহারায় সে ঝাঁপিয়ে পড়ে, মেঠো বেড়ালের ছানাগুলোকে আড়াল করে শেয়ালটাকে খেদিয়ে দেয়।

কিছু পরে আরেকটা চিত্তাকর্ষক পরীক্ষা চালাই আমরা।

ধেড়ে ইঁদুরের গর্ত খুঁড়ে কিশোর জীববিদরা দেখে, চোখ-না-ফোটা নয়টি ছোটো ছানা সেখানে ঘুমচ্ছে।

একটা ছানাকে আমরা নিয়ে যাই বেড়ালের কাছে, কিছুদিন আগে বাচ্চা দিয়েছিল সে। সঙ্গে সঙ্গেই বেড়ালটা চাঙ্গা হয়ে উঠল, কামড়ে ধরতে যাচ্ছিল তাকে। তাই ফিরিয়ে আনতে হল।

আগের মতো এবারেও আমরা একই জলে বেড়াল-ছানা আর নয়টা ইঁদুর-ছানাকে চান করাই। তারপর সবকটাকে দিই বেড়ালের কোলে। ভেজা বেড়াল-ছানাগুলো চিঁচিঁ করছিল, উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল মাতৃস্নেহ। বেড়ালটা শুধু নিজের ছানাদের নয়, ইঁদুর-ছানাগুলোরও গা চেটে দেয়, চানের পর তাদের গা থেকে বেড়াল-ছানার গন্ধ ছাড়ছিল।

রংবেরং বেড়াল-ছানাদের চেয়ে তিনগুণ ছোটো হলেও বেড়ালটা নেংটা ইঁদুর-ছানাদের গ্রহণ করে নিজের সন্তান হিশেবে।

এমন অসাধারণ সংসারটা ছিল যে খাঁচায় সেখানে সর্বদাই ভিড় জমত দর্শকদের। অনেকে বলাবলি করত, শিগ্গিরই বেড়ালটার 'মত পালটাবে', শেষকালে খেয়ে নেবে তার পোষ্যদের। একদিন এক বুড়ি এসে, দেখে-শুনে থুতু ফেললে:

'ছিঃ! মাগো, বেড়ালকে কী রকম নষ্ট করেছে!..'

আমরা মোটেই বুড়ির সঙ্গে একমত হই নি, বরং খুবই আনন্দ হয়েছিল পরীক্ষার সাফল্যে।

ধেড়ে ইঁদুর-ছানারা বড়ো হয়ে উঠল। সৎ-মা আর তার বেড়াল-ছানাদের কাছে কোনোই সংকোচ বোধ করত না তারা। অবিশ্যি নয়টা ছানার সবকটিই টিকে থাকে নি। বেঁচে ছিল মাত্র পাঁচটি, তবে এই পাঁচটিরই ছিল সবচেয়ে বেশি সামর্থ্য, সহ্যশক্তি, জীবনের সঙ্গে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা। মারা যায় অপেক্ষাকৃত দুর্বলেরা এবং যাদের মুখ বেড়ালের মাই টানার মতো যথেষ্ট বিকশিত হয় নি।
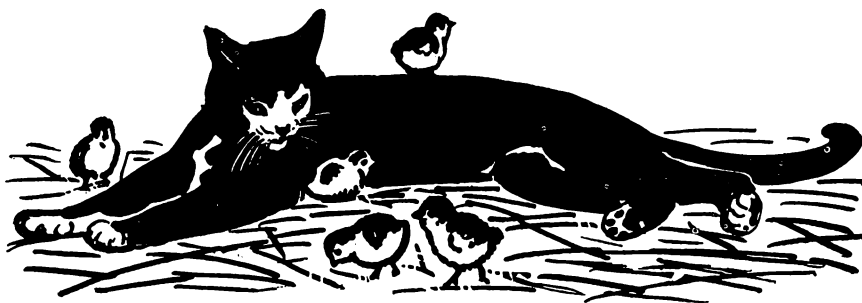
নিজের ছানা আর পোষ্যদের মধ্যে কোনো তফাৎ করত না বেড়ালটা, সমানভাবেই যত্ন করত তাদের। দূরে চলে যাওয়া ইঁদুর-ছানাদের সে সন্তর্পণে কামড়ে ধরে ফের নিয়ে আসত ঝুড়িটায়।

কালক্রমে ছানাগুলো হয়ে উঠল ধেড়ে ইঁদুর; আগের মতোই তারা শান্তিতে থাকত সৎ-মায়ের সঙ্গে, মা চিৎ হয়ে শুয়ে খেলা করত তাদের নিয়ে।

তবে বেড়ালের মাতৃস্নেহ আরো পারঙ্গম। একবার সাভিনো স্টেশনের রেল-কর্মীর স্ত্রী ভানেয়েভা আমায় চিঠি লিখে জানান কীভাবে মুরগী-ছানা মানুষ করেছে বেড়াল।

মুরগী-ছানাগুলোর জন্ম হতেই তাদের মা মারা যায় এক দুর্ঘটনায়। এই বয়সে খাদ্য ছাড়াও তাদের দরকার তাপ।

ঠাণ্ডা বোধ করলেই তারা সে তাপ পেত বেড়ালের গা থেকে।

সদ্য ডিম ফুটে বেরনো পাঁচটা মুরগী-ছানাকে ভানেয়েভা রাখেন বেড়াল আর বেড়াল-ছানাদের বাক্সে। যা আশা করা যায় না, বেড়ালটা আশ্চর্য যত্ন নেয় মুরগী-ছানাদের, চিঁচিঁ করলে সস্নেহে গা চেটে দিত তাদের।

সবকটার মধ্যে টিকে থাকে কেবল একটা মোরগ। বেড়াল-ছানাগুলোর সঙ্গে তার ছিল সত্যিকারের বন্ধুত্ব। বেড়ালটা তার বাচ্চাদের জন্যে প্রায়ই নিয়ে আসত চড়ুই বা অন্য কোনো ছোটো ছোটো পাখি, অথচ মুরগী-ছানাটার ওপর কখনো সে হামলা করে নি।

স্ভের্দ্লভস্ক অঞ্চলে গারি গ্রামের এক চিঠিতে আছে আরো মজার এক ঘটনা।

ইনকিউবেটর যন্ত্রের মতো চুল্লিতে টুপির মধ্যে কতকগুলো ছেলেমেয়ে মুরগীর ডিম ফুটিয়ে তিনটে বাচ্চা করে। কার যেন মাথায় খেলে, বাচ্চাগুলো মানুষ করতে দেবে বেড়াল দীম্‌কার কাছে, সম্প্রতি বাচ্চা হয়েছে তার। দিনে বেড়ালের উপস্থিতিতেই মুরগী-ছানাদের রাখা হল সেখানে। করুণ স্বরে চিঁচিঁ করা হলুদ গুটলিগুলোকে চট করে শুঁকে একটা ছানাকে কামড়াতে যাচ্ছিল সে। কিন্তু ছেলেদের হাতে চড় খেয়ে সে এই অসাধারণ প্রতিবেশিত্ব মেনে নেয়।

প্রথম দিন ছেলেদের তত্ত্বাবধানে বেড়ালটার কাছে মুরগী-ছানাগুলো ছিল দু'ঘণ্টা। পরের দিন আরো বেশি। পরের দিন রাত্রের জন্যেও তাদের রেখে দেওয়া হয় বেড়ালের কাছে। সে পরীক্ষাটা পুরো সফল হয়।

এইভাবে কাটে তিন সপ্তাহ। বেড়াল-ছানাগুলোর মধ্যে নিশ্চিন্তে ঘুমাত মুরগী-ছানারা, আর বেড়াল-মা তার নিজের বাচ্চাদের মতোই তাদেরও গা চেটে দিত সযত্নে। তবে চতুর্থ সপ্তাহে দেখা গেল দুটো মুরগী-ছানা মরা, বড়ো বেশি অসতর্কে দীম্‌কা গা এলিয়েছিল ঝুড়িতে, তাতে হঠাৎ পিষে যায় তারা।

সকালে মরা ছানাদুটো দেখে ছেলেরা তা ছুঁড়ে ফেলে দেয়, কিন্তু শিগ্‌গিরই বেড়াল তার মৃত পোষ্যদের সন্ধান পায়, শোঁকাশুঁকি করে, এপাশ-ওপাশ ওলটায়; এক-একবার চলে যায়, আবার ফিরে আসে, যেন ওর পেছু পেছু যাবার জন্যে ডাকছে। বেড়ালটার আকুলতা থামাবার জন্যে ওদের গোর দিতে হয় মাটিতে।

এইভাবে টিকে রইল কেবল একটা মুরগী-ছানা। বেড়ালের সঙ্গে পাশাপাশি তার কাটে দু'মাস, অবশেষে বেড়াল-ছানাগুলোকে বিলিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু তারপরেও বেড়ালের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব যায় নি।

১কাস্কীর আর কাস্কীরকা

মস্কোর চিড়িয়াখানায় আসে অল্পবয়সী দুটি নেকড়ে। দুটিতে ভাই-বোন, নাম কাস্কীর আর কাস্কীরকা, কাজাখ ভাষায় যার অর্থ 'নেকড়ে' আর 'নেকড়ী'। আনা হয় তা আরল সাগরের উত্তর-পশ্চিমের 'বড়ো বারসুকি' মরুভূমি থেকে।

চিড়িয়াখানার খাঁচায় দিন কাটিয়ে গেছে অনেক নেকড়েই, তাদের ভেতরে তফাৎও খুব আছে: কেউ সহজেই বশ মানে, যদিও ধরা পড়ার সময় ছিল বেশ বয়স্কই। ছোটোতেই কারো কারো মধ্যে দেখা দেয় শ্বাপদের হিংস্রতা। কাস্কীর আর কাস্কীরকা প্রথম দিন থেকেই ছিল অসাধারণ শান্ত, চট করেই তারা একেবারে পোষ মেনে গেল।

শ্রমিকদের ক্লাবে, লাল ফৌজী ইউনিটে, স্কুলে বক্তৃতা দেবার সময় আমি তাদের নিয়ে যেতে শুরু করলাম। অল্প দিনের মধ্যে জীবন্ত প্রদর্শন-দ্রব্যের ভূমিকা রপ্ত করে নিলে দু'জনেই, সাগ্রহেই লাফিয়ে উঠত মোটরে, বক্তার সামনের টেবিলে বাধ্যের মতো বসে থাকত, মন দিয়ে তাকে আর শ্রোতাদের দেখত।

চিড়িয়াখানার বড়ো একটা জনবহুল প্রেক্ষাগৃহে আমি গৃহপালিত কুকুরের উৎপত্তির কথা বলছিলাম, আর উইঙ্গের পেছনে চর্মরজ্জুতে বাঁধা কাস্কীরকা বসে বসে অপেক্ষা করছিল কখন মঞ্চে যাবার ডাক পড়বে। যখন নেকড়ীকে দেখাবার সময় হল, তাকে স্বস্থানে পাওয়া গেল না। একা একা বসে থাকতে বিরক্তি ধরে যাওয়ায় সে বগলস খুলে উধাও হয়েছে।

আমরা প্রমাদ গণলাম: সে সময় চিড়িয়াখানা যে লোকে লোকারণ্য। কিন্তু কাস্কীরকার স্বভাব খুব নিরীহ। দর্শকদের ভিড়ের মধ্য দিয়ে সে শান্তভাবে ছুটে যায় তার নিজের খাঁচার দিকে। পলাতকাকে আমরা পাই সেখানেই। ঠিক দুয়োরের সামনে বসে বসে সে ভেতরে ঢোকার জন্যে মিনতি করছিল।

আরেকবার জামোস্ক্‌ভোরেচিয়ে'তে বক্তৃতার সময় পালিয়ে গিয়ে কাস্কীরকা আমাদের ভয় পাইয়ে দিয়েছিল আরো বেশি। কিন্তু এবারেও
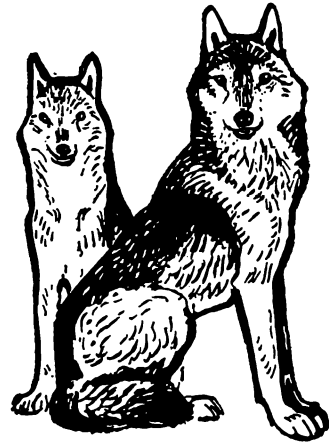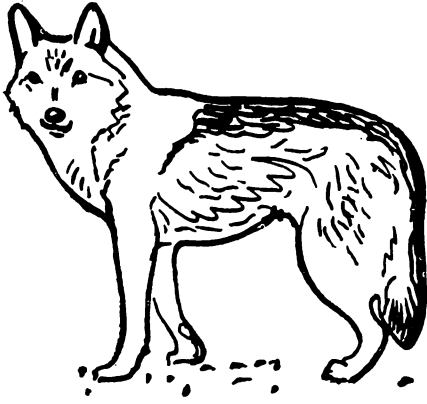
আমাদের আতঙ্কটা দেখা গেল অনাবশ্যক। বক্তৃতাস্থলে মোটরে করে এলেও সে ঠিক পথ খুঁজে পৌঁছয় চিড়িয়াখানায়। কারো ক্ষতি করে না।

বোঝা যাচ্ছে, রাস্তায় কেউ নেকড়ের দিকে নজর করে নি, কারো চোখে পড়লে ভেবেছে বড়ো একটা অ্যালসেশিয়ান।

যাদেরকে ভালো চিনত, তাদের প্রতি কাস্কীর আর কাস্কীরকা ছিল অসাধারণ সোহাগী। নেকড়ের নেকনজরে থাকা লোকেদের ওপর 'আক্রমণের' অভিনয় করে দেখেছি আমরা, মুহূর্তের মধ্যে তারা হিংস্র ও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠত।

কোনো রকম প্রাথমিক হুঁশিয়ারি না দিয়ে তারা চেষ্টা করত তক্ষুনি কামড়ে ধরতে। এইসব কল্পিত শত্রুদের ওরা অনেকদিন ভুলত না। 'আক্রমণকারী' পরে খাঁচার সামনে দেখা দিলেই তারা খেঁকিয়ে উঠত, ভাঙতে চাইত লোহার শিক।

পরে বড়ো হয় কাস্কীর আর কাস্কীরকা, একেবারে ঝুনো নেকড়ে। তাহলেও চেন না বেঁধে অবাধে তাদের নিয়ে ঘোরা যেত শহরের বাইরে। 'নেকড়েকে যতই পোষো, নজর তার বনের দিকে' এই লোকবচনের বিপরীতে কাস্কীর আর কাস্কীরকা কখনো মানুষের সঙ্গ ছেড়ে যেতে চায় নি।

নেকড়েদের জীবন ও চালচলন অনুধাবন করলে সত্যিসত্যিই নিঃসন্দেহ হতে হয় যে পরে প্রচুর সংখ্যক নানা জাতের গৃহপালিত কুকুর গড়ে উঠেছে যা থেকে, সেই বশীকরণ ও গৃহপালন একদা, মোটামুটি বিশ হাজার বছর আগে শুরু হয়েছিল এই জন্তুগুলো দিয়েই।

চিড়িয়াখানায় যারা প্রায়ই নেকড়েদের লক্ষ্য করেছে, তাদের চোখে পড়বে যে বাইরের চেহারায় তাদের একটা সাধারণ মিল থাকলেও নানান গুণের দিক দিয়ে তারা খুবই পৃথক। সুদূর অতীতে এই পার্থক্য থেকেই মানুষ কৃত্রিম বাছাই চালিয়ে বংশগত পরিবর্তন মারফত বিভিন্ন জাতের কুকুর পায়। প্রসঙ্গত, একেবারে সাধারণ নেকড়েকেও তালিম দিয়ে স্লেজে জোতার কাজে লাগানো যায়। চূড়ান্ত

উত্তরাঞ্চলে এ কাজে কোনো কুকুরই নেকড়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না, কেননা শক্তি ও সহ্যগুণে সবাই তারা হার মানে নেকড়ের কাছে।

পোষমানানো, গৃহপালিত নেকড়ে থেকেই এসেছে মানববন্ধু ঘরোয়া কুকুর। এটা অতীত কালে নেকড়ের সদর্থক ভূমিকা। কিন্তু এখন পশুপালন ও প্রয়োজনীয় আরণ্যক পশুর যে ক্ষতি বুনো নেকড়ে করে তা সইবার নয়।

ক্ষিপ্ত সীলমাছ

একবার ক্যাস্পিয়ান সাগরের উপকূলস্থ দেরবেন্তের কাছে আশ্চর্য এক ব্যাপার ঘটেছিল। সে ঘটনা আমায় বলেন স্থানীয় বৈজ্ঞানিক কর্মীদের একজন।

একটা লোক ঠিক করে সমুদ্রে চান করবে, কিন্তু সাঁতার জানত না সে। জলে নামার আগে মোটরের চাকার টিউব সে ভালো করে পাম্প করে। তাতে জলে ডোবার ভয় ছিল না, হাওয়া-ভরা বেষ্টনী মানুষকে চমৎকার ভাসিয়ে রাখে জলের ওপর।

হঠাৎ সমুদ্রের গভীর থেকে ভেসে ওঠে একটা ক্যাস্পিয়ান সীলমাছ। ক্ষিপ্ত দর্শনে তা আক্রমণ করে স্নানার্থীকে। মরীয়া হয়ে সে ঘুসি চালায়, আর নিজের দেহের চেয়েও বেশি করে সে রক্ষা করে রবারের টিউবটাকে।

'বাঁচাও!.. বাঁচাও!..' শোনা গেল চিৎকার।

অকুস্থলের অল্প দূরে দৈবাৎ একটা জেলে নৌকো ছিল, চিৎকার শুনে জেলেরা জোরে নৌকো চালিয়ে আসে। এসে পেঁছয় তারা ঠিক সেই মুহূর্তে যখন পুরো পাম্প-করা টিউবটাকে সীলমাছ কামড়ে ছিড়ে ফেলে। অভাগা স্নানার্থীকে জেলেরা নৌকোয় টেনে তোলার সময় না পেলে বেচারা নিঃসন্দেহেই তলিয়ে যেত। লোকটার পায়ে প্রচণ্ড প্রচণ্ড কামড়। প্রচুর রক্ত ক্ষরছিল তা থেকে।

লোকটাকে বাঁচিয়ে জেলেটি দাঁড় দিয়ে ঘা মারে সীলমাছটার ওপর। জন্তুটা ডুব দেয়, কিন্তু ফের ভেসে ওঠে তীরের অদূরে এবং লাফিয়ে পড়ে সৈকতে। সেখানেই ছুরি মেরে শেষ করা হয় তাকে।

ক্যাস্পিয়ান সীলমাছের এমন অস্বাভাবিক আচরণের কারণ কী, তা জিজ্ঞেস করা হয় আমায়। মানুষের ওপর সীলমাছের হামলার কথা আমি আগে কখনো শুনি নি, তাই আমিও জিজ্ঞেস করলাম বড়ো বড়ো বিশেষজ্ঞদের, বিভিন্ন সমুদ্রের সীলমাছ নিয়ে যাঁরা গবেষণা করছেন। আমার মতনই এঁদের কেউই শোনেন নি যে জলে মানুষকে আক্রমণ করেছে সীলমাছ। তখন আমি টের পেলাম যে দেরি করা চলে না, টেলিগ্রাম পাঠালাম:

'সীলমাছটা ক্ষেপা। অবিলম্বে ইঞ্জেকশন নিন।'

কিন্তু সীলমাছকে কামড়াতে পারে অন্য কোন ক্ষিপ্ত জীব? অনুমান করা যেতে পারে যে সীলমাছকে কামড়েছে কোনো ক্ষেপা শেয়াল, আর সেটা ঘটেছে, যখন ডাঙায় জবুথবু সামুদ্রিক জীবটা রোদ পোয়াচ্ছিল তীরে উঠে। এ অনুমান খুবই সত্য হওয়া সম্ভব, কেননা এই জায়গায় হিংস্র শেয়াল বিস্তর, আর ক্ষেপা শেয়ালও কম নয়।

বলা দরকার যে কোনো জন্তুর ক্ষিপ্ততা শুরু হয় অন্য কোনো ক্ষেপা জন্তুর কামড়ে। ক্ষেপা ধেড়ে ইঁদুর, ইঁদুর, বেড়ালের কামড়ের ঘটনা কম নেই। ক্ষেপা চড়ুইয়ের হামলার কথাও শোনা গেছে। এমন কথাও শুনেছি যে, বিচ্ছিন্ন খাঁচায় কয়েক বছর কাটাবার পর ইঁদুরের কামড়ে ক্ষেপে গেছে নেকড়ে।

ক্ষিপ্ত জন্তুদের উচ্ছেদ করলে এই ভয়াবহ রোগটা লোপ পাবে সর্বত্রই।

জিন-দাউ

মস্কোর চিড়িয়াখানায় ভারতীয় মাদী হাতি জিন-দাউ কাটায় বারো বছর। চিড়িয়াখানায় আসার আগে সে বড়ো বড়ো রোলার টেনে দুরমুশ করে বেরিয়েছে বোখারার রাস্তা, গাছ উপড়েছে। গৃহযুদ্ধের সময় কামান টেনেছে জিন-দাউ।

বোখারায় হাতিটা ছিল খোলা। খুব গরম পড়লে তাকে দেখা যেত বাগানে, গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে ঢুলত।

পরে মস্কো চিড়িয়াখানা উপহার পায় জিন-দাউকে। তখন সমস্যা দেখা দেয়: কি করে এই বিপুল জীবটিকে আনা যায় রাজধানীতে? মাল-ট্রেনের কোনো গাড়িতেই সে আঁটবে না, আর খোলা প্ল্যাটফর্মে চাপিয়ে আনাটা আমাদের মনে হয়েছিল বিপজ্জনক। শেষ পর্যন্ত চার অক্ষের বড়ো একটা প্ল্যাটফর্মের ওপর জিন-দাউ'এর জন্যে ঠাঁই বানানো ঠিক হল।

জিনিসটা বানাবার পর হাতিটাকে তাতে তোলার পালা। ওঠার আগে অনেকখন সে শুঁড় আর পা দিয়ে তার 'কুপে'র মজবুতি পরখ করে।

।
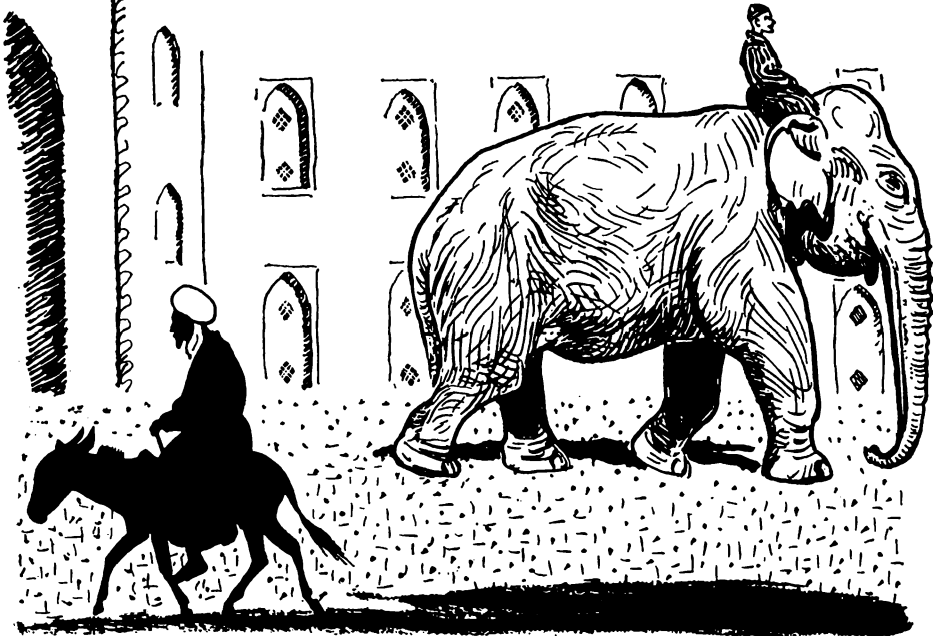
তাহলেও সে উঠল তাতে, বন্ধ হল তার চলমান খোঁয়াড়ের দরজা।

ইঞ্জিন লাগল। সন্তর্পণে ড্রাইভার গাড়ি ছাড়ল ধীরে ধীরে। কিন্তু স্থানান্তর গমনের অনভ্যস্ত এই পদ্ধতিটায় তক্ষুনি অশান্ত হয়ে উঠল জিন-দাউ। অস্থির হয়ে সে তার জন্যে অমন মজবুত করে বানানো জিনিসটা কয়েক মিনিটেই ভণ্ডুল করে দিলে। শান্ত হল সে মাথার ওপর খোলা আকাশ দেখে। তাই খোলা প্ল্যাটফর্মে চাপিয়েই তাকে আনতে হল মস্কোয়।

পথে সে ভালোই চলেছিল। রেলপথের ওপর দিয়ে সেতুর খিলান দেখলে সে বসে পড়ত পা গুটিয়ে, আর উল্টো দিক থেকে ট্রেন এলে আমাদের গুরুতনু 'সহযাত্রিনী' প্ল্যাটফর্মের বিপরীত দিকে ঘেঁষে যেত।

অমন অস্বাভাবিক একটা মাল যাচ্ছে ট্রেনে, এ খবর ছড়িয়ে পড়েছিল, ইঞ্জিনের গতির চেয়েও তাড়াতাড়ি, ভিড় জমত স্টেশনে। জিন-দাউ নিশ্চিন্তে শুঁড় বাড়িয়ে দিত তাদের দিকে, ভালো-মন্দ খাবার চাইত। অকাতরে লোকেরা দিত রুটি, তরমুজ, বাঙি।

একটা স্টেশনে জিন-দাউ হঠাৎ গর্জন করে শুঁড় দিয়ে একটা ঢেঙা ছোকরাকে তুলে নিয়ে ভিড়ের মাথার ওপর দিয়ে তাকে ছুড়ে ফেলে রাস্তার পাশের ঝোপের ভেতর। ভাগ্যি ভালো ছোকরা অল্পেই পার পায়। তক্ষুনি সে কবুল করে যে হাতির শুঁড়ে পিন ফুটিয়ে দিয়েছিল...

শেষ পর্যন্ত ১৯২৪ সালের ৭ই জুলাই ট্রেন পেঁছিল মস্কোয়। স্টেশন থেকে চিড়িয়াখানার উদ্দেশে জিন-দাউ রওনা দিলে রাত তিনটেয়। বিরাট পশুটার ঘাড়ের ওপর বসলে মাহুত।

অত রাত সত্ত্বেও প্রচুর লোক হাতিটার সঙ্গে সঙ্গে আসে চিড়িয়াখানার দেউড়ি পর্যন্ত।

অসম্ভব জোর ছিল জিন-দাউ'এর। বেরিয়ে বেড়াবার বাসনায় সে ধীরেসুস্থে বেঁকিয়ে দেয় পার্টিশনের জগদ্দল লোহার থাম। একবার তার ঘরের ভারি দরজাটার রোলার সরে গিয়ে সেটা তার রেলের খাঁজ থেকে পড়ে যায়। একদল লোক শাবল ডাণ্ডা নিয়ে সেটাকে নড়াতে পারে না।

নানা রকম হাতলের সাহায্যে লোকেরা বিশমনী লোহার পাতটাকে স্বস্থানে বসাবার চেষ্টা করে ঘণ্টাখানেক ধরে, কিন্তু হয় না কিছুই। তখন রসিকতা করে কে একজন ডাকে জিন-দাউকে। তক্ষুনি সে আসে, সন্তর্পণে লোকেদের সরিয়ে দেয়

কাছ থেকে, শুঁড় দিয়ে হ্যাঁচকা টান দিলে দরজায়। অমনি সেটা উঠে গেল রেলের খাঁজে।

ঘুমবার সময় হাতিটা কাত হয়ে শুয়ে পা টান করে দিত। গোটা বাড়িটা ভরে উঠত তার নাক-ডাকায়। কিন্তু একটু উদ্বেগের কারণ ঘটলেই সে এমন ক্ষিপ্রতা ও লঘুতায় খাড়া হয়ে উঠত যা অমন সুবিশাল, বেঢপ দেখতে একটা পশুর ক্ষেত্রে আদৌ কল্পনা করা যায় না।

হাতিরা যখন বনে থাকে, তখন তাদের নখ আর পায়ের তলাকার চামড়া আপনা থেকে পাথরে লেগে বন্ধুর মাটিতে ঘষা খেয়ে ক্ষয়ে যায়। কিন্তু আটকা থাকলে তা বেড়ে ওঠে, তাই কেটে ফেলতে হয় তা। অস্ত্রোপচারটা কখনো কখনো যন্ত্রণাকর, কিন্তু জিন-দাউ তা সহ্য করত বেশ শান্তভাবেই। কিন্তু অসহ্য হয়ে উঠলে রেগে শুঁড় দিয়ে ঘা মারত মেঝেতে, যেন খানিকটা বিরাম দিতে বলছে।

একবার এই কাজটা যখন চলছে, তখন বারকয়েক জোরে জোরে তার শুঁড় আছড়ানো, এমনকি ভীতিপ্রদ কর্ণভেদী ডাকেও লোকটা কান দেয় নি। উখো দিয়ে সে ঘষেই চলছিল তার নখ। জিন-দাউ তখন সাবধানে লোকটার ঘাড় ধরে তুলে বাতাসে কয়েকবার ঝাঁকিয়ে নিজের ডেরা থেকে ছুঁড়ে দেয় দুটো লোহার থাম্বার মাঝখানে...

চিড়িয়াখানায় থাকার শেষ দুই বছরে ভারি স্থবির হয়ে পড়ে জিন-দাউ। বারকয়েক বেশ ভুগল সে, দ্রুত জরার লক্ষণ ফুটে উঠতে লাগল পরিষ্কার। বয়স তখন তার বাহান্নের মতো। প্রায়ই শুয়ে থাকত সে, হাঁটত পা ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে।

জায়গাটা পুনর্নির্মাণের সময় হাতিদের স্থানান্তরিত করা হয় হরিণ এলাকায়।

সেখানে তাদের বিশেষ সুবিধা লাগছিল না। এমনকি ঘুমোবার জন্যেও শুতে চাইত না জিন-দাউ। মোটা জালি-বেড়ায় মাথা ঠেকিয়ে ঘুমত সে। ফলে সেটা ভয়ানক বেঁকে যায়।

১৯৩৬ সালের ডিসেম্বরে শুল হাতিটা, তারপর আর ওঠে নি। তার বান্ধবী, তরুণী হস্তিনী মান্‌কা হয়ে উঠল উদ্বিগ্ন। শুঁড় দিয়ে সে মুছে দিতে লাগল জিন-দাউ'এর বুড়ো পা, চেষ্টা করল তাকে তুলতে, কিন্তু সবই বৃথা।

দু'দিন পরে (২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৩৬) মারা গেল জিন-দাউ।

শব-ব্যবচ্ছেদ করে দেখা গেল তার কশের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চারটে দাঁত ভয়ানক ক্ষয়ে গিয়েছিল।

শেষ বয়সে জিন-দাউ আর খাবার চিবাতে পারত না, তা গিয়ে পড়ত দাঁতের ফুটোয়, মাড়ি আর দাঁতের মাঝখানগুলো ভরে তুলত।

বিশাল হাতিটার প্রত্যেকটা প্রত্যঙ্গই হয়ে গিয়েছিল ভারি জীর্ণ আর জরাগ্রস্ত।

আর তাদের আয়তন আর ওজন অবাক করার মতো। যেমন, এক-একটা কিডনির ওজন ১৬ কিলোগ্রাম করে, পিলে ২ মিটার লম্বা, শ্বাসনালীর ব্যাস ৭ সেণ্টিমিটার। অন্ত্রের মোট দৈর্ঘ্য ৩০ মিটারের বেশি।

ফুসফুসের ওজন ১০০ কিলোগ্রাম! আরেকটা ব্যাপার, জিন-দাউ'এর মাথার ঘিলু ৪৪২০ গ্রাম, সাধারণ মানের চেয়ে প্রায় দেড় কিলোগ্রাম বেশি।

আমরা যখন বলতাম যে জিন-দাউ বার্ধক্যে মারা গেছে, তখন হতভম্ব হয়ে অনেকে জিজ্ঞেস করেছে:

'বার্ধক্য কোথায়? ওর তো পঞ্চান্নও হয় নি, কিন্তু শোনা যায় হাতি বাঁচে দু'শ বছর!'

কিন্তু কথায় বলে, যা ঘটনা তা ঘটনাই। বাস্তবে ও গুজবটা সমর্থিত হয় নি। ফ্লউয়েরের তথ্য অনুসারে ইউরোপের বিভিন্ন চিড়িয়াখানায় চুয়াল্লিশটি ভারতীয় হাতির মধ্যে কেবল একটা মর্দা বাঁচে বড়ো জোর চল্লিশ বছর, শুধু তিনটে মাদী টিকে থাকে পঞ্চাশ-একান্ন বৎসর পর্যন্ত।

সাধারণত, এই যেসব জন্তুর সবকিছু নির্ভর করে তাদের দাঁতের ওপর, তাদের আয়ু আরো বেশি হবে সেটা অনুমান করা কঠিন। হাতির কশের দাঁত মাত্র চারটে:
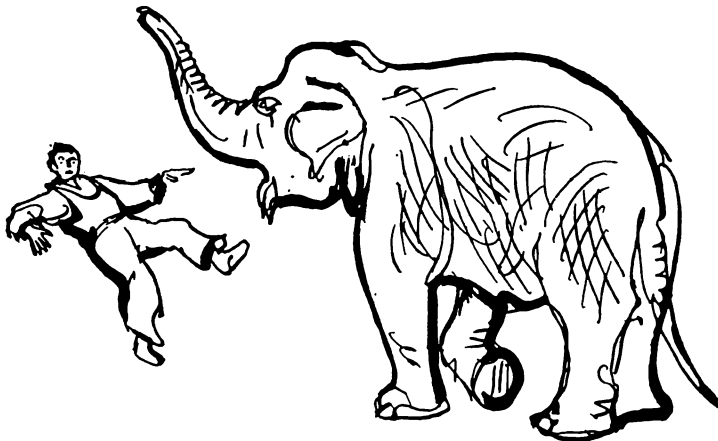
দুটো ওপরের চোয়ালে, দুটো নিচে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড এই দাঁত দিয়ে সে যাঁতার মতো মোটা মোটা ডালও গুঁড়িয়ে দেয়। ক্রমে ক্ষয়ে যায় দাঁত, আবার নতুন দাঁত ওঠে (জীবৎ-কালে ছয় বার)। শেষ দাঁত ওঠে চল্লিশ বছর বয়সে, তারপর বছর দশেকের মধ্যে তা খুবই ক্ষয়ে যায়।

জিন-দাউ'এর শেষ বারের দাঁত ওঠে মৃত্যুর দশ-এগারো বছর আগে। তাই অকালমৃত্যু তার হয় নি, বরং অনেক স্বগোত্রের চেয়ে বেশিই বেঁচে ছিল সে।

মাটি-খোঁড়া কুকুর

ওরেনবুর্গের কসাইখানাটা ছিল শহরের একেবারে প্রান্তে।

কসাইখানার পাশেই গভীর খাদ। মাংসে ডাক্তাররা কোনো সংক্রামক রোগের সন্ধান পেলে নিহত পশুর দেহ পুঁতে দেওয়া হত সেখানে।

প্রথমে পোঁতা হত অগভীর গর্তে। পরে দেখা গেল সেটা চলবে না: একপাল কুকুর এসে জুটত খাদে, সহজেই খুঁড়ে বার করত। ব্যাপারটা বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াল, কেননা শহরে সংক্রমণ ছড়াতে পারত কুকুরগুলো।

গর্ত খুঁড়তে হল গভীর করে। কিন্তু তাতেও ফল হল না: এমনকি কয়েক মিটার গভীর গর্ত থেকেও তারা টেনে বার করত লাশ।

কেউ কেউ তাদের মাটি খোঁড়ার কায়দাটা লক্ষ্য করছিলেন।

কমরেড হারিতোনভ চিঠিতে লেখেন:

'গর্ত খোঁড়ার সময় কুকুরদের মধ্যে যে শৃংখলা দেখেছি, তাতে অবাক হয়ে গেছি। খুঁড়তে খুঁড়তে একটা কুকুর ক্লান্ত হয়ে পড়লে অমনি আরেকটা কুকুর এসে জায়গা নেয় তার। দেখতে দেখতে গভীর হয়ে ওঠে গর্ত...'

সত্যি, শিকারীদের প্রায়ই চোখে পড়ছে কত অনায়াসে গর্ত খুঁড়তে পারে কুকুর, এবং সেটা শুধু আলগা মাটিতে নয়, অহল্যা মাটিতেও।

মাঝে মাঝে শিকারের সময় কুকুরের তাড়ায় কোনো একটা ছোটো জন্তু যখন তার গর্তে গিয়ে সেঁধয়, কুকুর তখন তার সামনের দুই থাবা দিয়ে ক্ষিপ্র গতিতে জন্তুটার গর্ত খুঁড়তে শুরু করে। কাজটা সহজ নয়, শিগ্‌গিরই ক্লান্ত হয়ে পড়ে কুকুর।

প্রচণ্ড হাঁপাতে হাঁপাতে সে পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ে। আর এতক্ষণ কাছেই নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল দ্বিতীয় যে কুকুরটা সে তখন তার জায়গা নেয়। সাধারণত বদলির কাজটা চলে এত দ্রুত যে এক মিনিটের জন্যেও কাজ থামে না।

জিরিয়ে নেবার সময় চতুষ্পদ মাটি-খুঁড়িয়ে মন দিয়ে লক্ষ্য করে তার বদলীকে, তার গতি শ্লথ হতেই ফের কাজে লাগে।
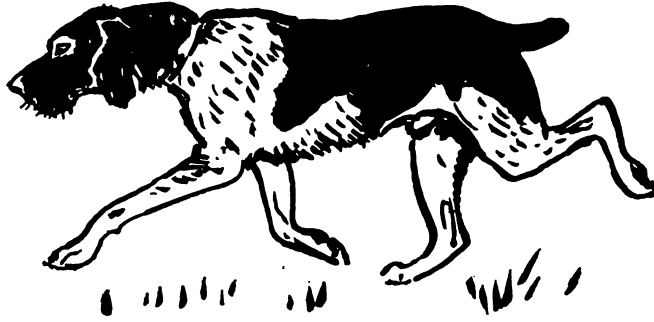
কুকুর কখন হাঁসের গন্ধ পায় না

'ভ্যালা এক কুকুর জুটেছে আমার! দেখুন-না, ডিমে তা দিচ্ছিল হাঁসটা, অথচ তার দু'পা দূর দিয়ে কুকুরটা চলে গেল খেয়াল না করে।'

খেদ করছিল এক শিকারী। তবে বেচারা কুকুরের এতে দোষ নেই। অতি তীক্ষ্ন ঘ্রাণশক্তি থাকলেও ডিমে-বসা হাঁসকে বার করা কঠিন।

পাখির গায়ে চর্বি বা ঘামের কোনো গ্ল্যাণ্ড নেই। শুধু একটা গ্ল্যাণ্ড আছে লেজের গোড়ায়, ককসিক্স,তা থেকে গন্ধময় চর্বির মতো একটা জিনিস বেরয়। গ্ল্যাণ্ড থেকে পাখি ঠোঁটে চর্বি খুঁটে তা পালকে মাখায়। জলচর পাখির বেলায় এই গ্ল্যাণ্ডটা খুবই বিকশিত, তাই সবাই তারা অনেকখন জলে লাফালাফি করতে পারে ভেজে না একটুও। লোকে তো আর খামোকা বলে না — 'যেন হংসপৃষ্ঠে জল'।

পাখি যখন ডিমে তা দেয়, তখন পালকে চর্বি মাখায় না, ফলে গন্ধও বেরয় না তার পালক থেকে। অনেক দূর থেকে গন্ধে গন্ধে তাকে ধরার উপায় থাকে না কুকুরের। এই বৈশিষ্ট্যটা পাখিদের বাঁচায়: গন্ধ না থাকায় হিংস্র জন্তু তাদের টের পায় না। তাছাড়া, পালক চর্বি মাখা থাকলে ডিমও নির্ঘাত তৈলাক্ত হয়ে উঠত, খোলার গায়ের যেসব ছিদ্র দিয়ে বাতাসের অক্সিজেন ভেতরে প্রবেশ করে, তা যেত বন্ধ হয়ে; দিনের আলো আর দেখতে হত না ভবিষ্যৎ ছানাটিকে, মারা পড়ত।

কিন্তু ডিম ফুটে ছানা বেরনো মাত্রই হাঁস 'সুন্দরী' হয়ে উঠতে শুরু করে, চটপট চর্বি মাখায় নিজের পালকে। ককসিক্স থেকে খুঁটে তোলা এক বিন্দু চর্বি হাঁসের দুই ঠোঁটের চাপে ছড়িয়ে পড়ে, আর তার মধ্য দিয়ে, যেন তৈলাক্ত দুই রোলারের

ভেতর দিয়ে সে এক-এক করে প্রতিটি পালককে টেনে নিয়ে যায়। গলা আর মাথায় চর্বি মাখায় সে সব শেষে, তৈলাক্ত পালকের গায়ে তা ঘষে।

হাঁসের বাচ্চা যদি হয় ইনকিউবেটরে, তাহলে দেখা যায় যে জলে তাদের গা ভিজছে, মাঝে মাঝে ডুবেও যায়, অথচ হাঁসের তত্ত্বাবধানে থাকা বাচ্চারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাঁতরতে পারে, জল থেকে ওঠে প্রায় একেবারে শুকনো গায়ে।

তার রহস্যটা আন্দাজ করা কঠিন নয়: হাঁস-মায়ের গায়ের তাপে গরম হবার সময় ছানাদের গায়ে লাগে চর্বি মাখা পালক, ফলে তাদের রোঁয়াও তৈলাক্ত হয়ে যায়, জলে গা ভেজে না। কিন্তু 'অনাথগুলোর' তেল মাখার জায়গা নেই, অথচ নিজেই নিজের যথাযোগ্য 'প্রসাধন' করার মতো ক্ষমতা তখনো তাদের হয় নি। জলে ওদের রোঁয়া প্রায়ই ভিজে যায়, ফলে গা ভারি হয়ে তলাতে থাকে। যারা কোনো রকমে ডাঙায় এসে উঠতে পারে, তারাও প্রায়ই মারা যায় ঠাণ্ডায়।

যা বললাম সেটা পরীক্ষার জন্যে আমরা ডিম-দেওয়া আর ডিম-না-দেওয়া কয়েকটা হাঁসের পালক ছিঁড়ে বিশ্লেষণ করি (সক্স্‌লেট যন্ত্রে)। দেখা গেল প্রথম দলের পালক প্রায় চর্বিহীন, দ্বিতীয় দলের পালকে চর্বি প্রচুর।

সূর্য-স্নান

সবাই নিশ্চয় জানে যে কোনো স্তন্যপায়ী জীবই ভালো বাড়তে পারে না রোদ ছাড়া। তাহলে ব্যাজার বা খটাশের মতো জন্তুরা, যারা সব সময় থাকে অন্ধকার গর্তে, শিকার ধরতে বেরয় কেবল সূর্যাস্তের পর, তারা তাদের বাচ্চা মানুষ করে কীভাবে? তাদের ভূগর্ভ ফ্ল্যাটে তো জানলা নেই, অথচ খটাশ-ছানাদের নিশ্চয় দরকার রোদ।

প্রশ্নটায় আগ্রহী হই আমরা। চিড়িয়াখানার কিশোর জীববিদদের একটা দল খটাশের গর্তের মুখ থেকে একটু দূরে দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণ চালায় ও ব্যাপারটা বার করে।

দেখা গেল যে দিনটা পরিষ্কার থাকলে খটাশ রোজ ভোরে ছানাগুলোকে তাজা হাওয়ায় নিয়ে আসে। সন্তর্পণে দাঁতে কামড়ে সে ছানাগুলোকে রাখে রোদের কাছে। কিন্তু কখনোই সরাসরি রোদে নয়, সর্বদাই ঝোপের তলে কিংবা গাছের নিচে, যেখানে পাতার ফাঁক দিয়ে রোদের ছোপ এসে পড়ে।

সবকিছুই ভালো কেবল একটা মাত্রার মধ্যে। সূর্য-স্নানের পক্ষে সেটা আরো সত্যি। চোখ-না-ফোটা বাচ্চাগুলো চেঁচাতে শুরু করলেই খটাশ-মা তাদের তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে আনত গর্তে। তখন খুবই ব্যস্ততা দেখা যেত তার, প্রায়ই একটার বদলে দুটো করে বাচ্চা বইত সে।

এই ব্যস্ততা মোটেই অনাবশ্যক নয়। অন্ধকারে থাকতে অভ্যস্ত জন্তুদের বেলায় মারাত্মক সর্দিগর্মি হয় কম নয়। খাঁচা থেকে প্রথম রোদে নিয়ে আসায় একবার

চিড়িয়াখানায় এমনি সর্দিগর্মিতে মারা যায় দুটো অল্পবয়সী বাঘের বাচ্চা। একই পরিণতি হয় সারা শীত আধা-অন্ধকারে কাটানো উস্তিতি বানর, আফ্রিকান তক্ষক, এমনকি বিশালাকার ভারান সরীসৃপ।

প্রাণীদের রোদ দরকার, তবে তার অপব্যবহার খুবই বিপজ্জনক; তাতে অভ্যস্ত হতে হয়, অর্থাৎ চামড়ার ন্যাড়া জায়গাগুলোকে রোদ-পোড়া করা দরকার। তাতে গড়ে ওঠে এক ধরনের আলোক-ফিলটার, অতি-বেগুনী কিরণ সমেত অন্যান্য রশ্মি তা প্রবেশ করতে দেয় মাত্রানুযায়ী।

বাচ্চাদের নিয়ে খটাশ-মা যা করে, তাতে ঠিক সেই মাত্রার সূর্যালোকের ব্যবস্থা হয়, যা তাদের প্রাণ বা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক নয়। এ অভ্যাসটা তাদের গড়ে উঠেছে স্বাভাবিক নির্বাচনে, সবচেয়ে মানিয়ে নিতে-পারাদের টিকে থাকার প্রক্রিয়ায়।
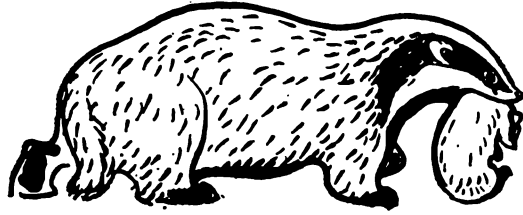
নবজাতকের জীবন

পুকুরটা বরাবরকার মতোই। চিড়িয়াখানায় অশ্রান্ত কাকলী।

কিশোর একজন জীববিদের সঙ্গে যাচ্ছিলাম তীর দিয়ে। হঠাৎ চোখে পড়ল 'একজন ডুবছে'। পড়ে ছিল সে তীরের কাছেই, রোদ্দুরের কাঁপা কাঁপা ছোপ পড়ছিল তার গায়ে। 'ডুবন্তটি' হল চোখ-না-ফোটা ছোট্ট একটা বিড়াল-ছানা। সবুজ শ্যাওলায় তার গা জড়ানো, যেন ছাতা পড়েছে।

আমার সহযাত্রী ওটিকে টেনে তুলল। নিথর প্রাণীটা থেকে জীবনের কোনো লক্ষণই মিলল না। মনে হল বাচ্চাটা অনেক আগেই ডুবে মরেছে।

আমরা যখন ওকে খুঁটিয়ে দেখছিলাম, তখন ডুবন্তের নাক থেকে জল ঝরতে লাগল, আমাদের হাতের গরমে শরীরটা তার গরম হয়ে উঠল খানিকটা, হঠাৎ সামান্য কেঁপে উঠল বেড়াল-ছানা।

ধীরে ধীরে জীবন ফিরে পেল সে।

বেঁচে-ওঠা বাচ্চাটাকে মানুষ করার জন্যে দেওয়া হল চিড়িয়াখানার যে বিড়ালীর কাছে, কয়েকটা কালো মেঠো বেড়াল-ছানাকে পালছিল সে। তার যত্নে পোষ্যটি দ্রুত শক্ত-সমর্থ হয়ে ওঠে, তারপর বড়ো হয়ে ঠাঁই নেয় আমাদের একজন বৈজ্ঞানিক কর্মীর বাড়িতে।

এত সহজে ছানাটা প্রাণ ফিরে পেল কেন? সে তো ছিল পুকুরের জলের মতোই ঠাণ্ডা।

আসলে, ভ্রূণাবস্থায় সমস্ত প্রাণীই তাদের সুদূর পূর্বপুরুষদের বিবর্তনের (ঐতিহাসিক বিকাশের) বিভিন্ন স্তরের পুনরাবর্তন করে একটা নির্দিষ্ট মাত্রায়।
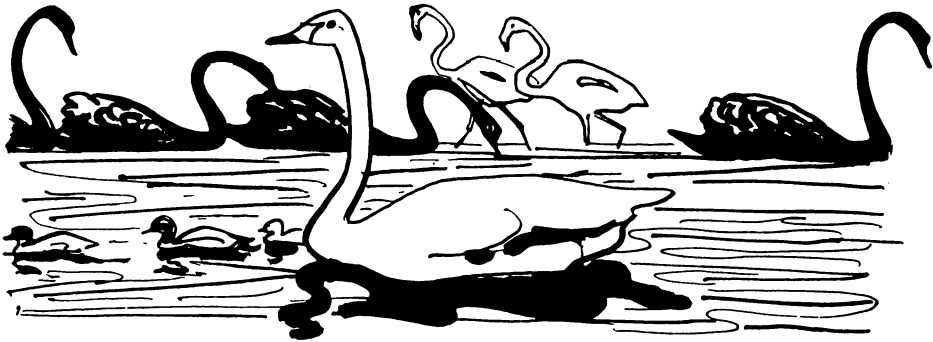
জন্মের ঠিক পরে পরে, বাচ্চাদের সঙ্গে বয়স্ক জন্তুদের তফাৎ থাকে অনেক ব্যাপারেই, অনেক নিচু স্তরে বিকশিত তাদের অতীত পূর্বপুরুষদের কিছু কিছু লক্ষণ তাতে ফুটে ওঠে। যেমন, অধিকাংশ স্তন্যপায়ী জীবের সাধারণ দেহতাপ হল ৩৭—৩৮ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেডের মতো। কিন্তু বাইরে থেকে তাপ না পেলে (যেমন, মা-বাপের গা ঘেঁষে গরম না হলে) এসব জীবের বাচ্চা, বিশেষ করে চোখ যাদের সঙ্গে সঙ্গে না ফোটে, তারা তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হতে থাকে। মৃত্যু না ঘটিয়ে একটা বয়স্ক কুকুরের তাপমাত্রা ২৭ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেডের নিচে নামানো প্রায় অসম্ভব; সদ্যোজাত কুকুর-ছানার তাপমাত্রা কিন্তু ১০ ডিগ্রির নিচেও নামানো গেছে। তখন তারা একেবারেই নিশ্চল হয়ে যায়, কিন্তু খানিকটা গরম করলেই ফের সজীব হয়ে ওঠে। আমরা এমন অনেক ঘটনাই জানি, যখন বন্য পশুর পুরো একপাল বাচ্চা এমন ঠাণ্ডা হয়েছে যে মনে হবে মরা। কিন্তু একটু গরম হতেই তারা 'বেঁচে উঠেছে' এবং পরে বেড়ে উঠেছে স্বাভাবিকভাবেই।

একবার রাতে খুব ঠাণ্ডা পড়ায় চিড়িয়াখানায় ইউরোপীয় জাতের মিঙ্ক ফার-পশুর দুটো বাচ্চা জমে যায়, চুল্লিতে গরম করায় তারা 'বেঁচে ওঠে'।

বাচ্চাদুটো মারা যায় নি বটে, তবে প্রাণশক্তি তাদের এত ক্ষীণ ছিল যে চোখে দেখে বা হাতে ছুঁয়ে তা আমরা টের পাই নি। শূন্যের খানিকটা নিচু তাপমাত্রায় জমে যাওয়া খরগোস-ছানাদের গরম কামরাতে আনার পর তারা শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলে, চাঙ্গা হয়ে মাই খেতে শুরু করেছে।

পাখিদের বেলায় এটা আরো খাটে, স্তন্যপায়ীদের মতো এদেরও সুদূর পূর্বপুরুষ ছিল প্রাচীন সরীসৃপ, বাঁধা দেহতাপ তাদের ছিল না। বয়স্ক পাখিদের কায়েমী দেহতাপ অবশ্য উঁচু: ছোটো ছোটো পাখিদের বেলায় তা ৪৪ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড পর্যন্ত ওঠে। তবে অন্য অনেক লক্ষণে পাখিরা সরীসৃপের সমতুল্য। সাদৃশ্যটা দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রেই: সরীসৃপদের মতোই পাখিদেরও ঘাম আর চর্বি নিষ্কাশনের গ্ল্যাণ্ড নেই (শুধু লেজের গোড়ায় কর্কাসক্লের গ্ল্যাণ্ডটা বাদ দিলে); সরীসৃপদের মতো পাখিদের নিষ্ঠীবনেও থাকে ইউরিক অ্যাসিড; ল্যাণ্ডরেল বা উটপাখির মতো কিছু কিছু পাখির বেলায় এখনো পর্যন্ত ডানার ডগায় সরীসৃপ-নখর থেকে গেছে, সমস্ত পাখির পায়েই আছে শৃঙ্গজাতীয় আঁশ। যেসব পাখির ছানা চোখ না ফুটে আর বিনা পালকে গজায়, সরীসৃপের সঙ্গে তাদের মিল খুব বেশি: চট করেই তাদের দেহতাপ ঠাণ্ডা হতে থাকে। গরম হবার জায়গা না থাকলে তাদের প্রাণ-

লক্ষণ চোখে পড়ে কম। বাইরে থেকে তাপ পেলে এরা শুধু বেঁচেই ওঠে না, প্রাণশক্তি বাড়ে আগের চেয়ে অনেক। এককালে অতীতের কিশোর জীববিদ, বর্তমানে বৈজ্ঞানিক গবেষক ন. কালাবুখভ, আ. রিউমিন একবার চড়ুই-ছানাদের ঠাণ্ডা করেন ৫ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেডে।

সে অবস্থায় মনে হল ছানাগুলো যেন জমে কাঠ হয়ে গেছে; কিন্তু গরম করার পর তারা সজীব হয়ে ওঠে, ঠোঁট ফাঁক করে খেতে চায়।

একাধিকবার আমি দেখেছি, বাচ্চাদের গা গরম রাখে যারা, সেই মা-বাপকে বাসা থেকে তাড়িয়ে দিলে খারাপ আবহাওয়ায় কত দ্রুত ঠাণ্ডা হয়ে যায় সদ্য ফোটা ছানারা। ছানাদের তখন রোঁয়া না থাকলেও এই সাময়িক শীতলতায় ক্ষতি হয় নি তাদের। পরে একেবারে স্বাভাবিকভাবেই তারা বেড়ে উঠেছে।

মুরগী, হাঁসজাতীয় যেসব পাখির ছানা জন্মের কিছু পরেই স্বাধীনভাবে ছোটাছুটি শুরু করে, তাদের বেলাতেও এই ঘটে। এ সময় তাদের কাছে চুল্লির কাজ করে মা, গিয়ে গরম হয়ে নেওয়া যায়।

নিশ্চয়ই সবাই দেখেছে, আঙিনায় চরে বেড়াবার সময় মুরগী মাটিতে বসে পড়ে তার ছানাগুলোকে জুটোয় পাখার তলে। নিজের গায়ের সঙ্গে ঠেসে ধরে গরম করে তোলে ওদের।

তাই, মুরগী-ছানাদের গায়ের তাপ বেশ ঘন ঘনই বদলায়। মায়ের কাছ-ছাড়া হয়ে ছোটার সময় এই ঠাণ্ডায় কাঁপছে, এই আবার মায়ের পাখার তলে গিয়ে গরম হচ্ছে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে তাপমাত্রার এই লাফালাফিতে শক্ত হয় মুরগী-ছানা, ত্বরান্বিত হয় তার বাড়। সরীসৃপদের বেলাতেও এ ব্যাপারটা দেখা যায়, আর তাপমাত্রার দোলনের দিক থেকে বয়স্ক মুরগীর চেয়ে সরীসৃপের সঙ্গেই মুরগী-ছানার বেশি মিল। দিনের বেলায় রোদে গরম হয়ে উঠে রাতে ভয়ানক ঠাণ্ডা হয়ে যায় সরীসৃপ। সমান মাত্রার একই রকম উঁচু তাপমাত্রায় তাদের শরীর খারাপ লাগে। তাই চিড়িয়াখানায় যে বাক্সে সাপ, গিরগিটি আর কাছিম থাকে, সেখানে তারা গিয়ে জোটে বিজলী বাতির তলে, তারপর দেহ ৩৬—৩৭ ডিগ্রি গরম হলে তারা খুব প্রাণচঞ্চল হয়ে ওঠে এবং সরে যায় ছায়ায়। বাতাসের তাপমাত্রা বরাবর উঁচু থাকলে এরা বন্দিদশা তেমন সইতে পারে না।

গৃহপালিত পাখির এইসব বৈশিষ্ট্যের কথা জানা থাকলে তা ব্যাবহারিক কাজেও ফল দেয়।

কিছুকাল আগেও পোলট্রি খামারগুলোয় ছানাদের রাখা হত বরাবরই উঁচু তাপমাত্রায়, মাত্র কয়েক ডিগ্রি তাপ নামাতেও ভয় পেত লোকে। এখনো সকলের সে ভয় কাটে নি, আর তা থেকে বেড়ে উঠত দুর্বল অপুষ্ট ছানা।

কোনো একটা প্রাণীর স্বাভাবিক বিকাশের ব্যবস্থা করতে হলে পরিবেশের কাছে তার দেহযন্ত্রের কী দাবি ঐতিহাসিকভাবে গড়ে উঠেছে, সেটা হিশেবে রাখা দরকার বেশি।

পেটুক পাইথন

ভারত থেকে মস্কোয় আনা হল জালি-আঁকা এক পাইথন। পৃথিবীর বৃহত্তম সাপেদের অন্যতম এরা। এই দানবটি ছিল লম্বায় প্রায় আট মিটার, ওজনে একশ বিশ কিলোগ্রাম।

এহেন অজগরের শক্তি বিপুল। প্রকাণ্ড দেহের পাকে পাকে সে জন্তুকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিয়ে তার বুক পিষতে থাকে, যেন ইস্পাতের সাঁড়াশি।

কবলে পড়া জন্তুটির দম বন্ধ হয়ে যায়, করাল আলিঙ্গনে মারা পড়ে সে। আর শিকারের দেহের খিঁচুনি যখন থেমে যায়, তখন তার পাক খুলতে থাকে সাপ, এবং নিশ্চল জন্তুটার মাথা থেকে শুরু করে গোটাগুটি গিলতে থাকে তাকে, খিদে মেটায় মাসখানেক কি আরো বেশি দিনের জন্যে।

নিজের বধ্যের হাড় কখনো ভাঙে না পাইথন, যদিও তার পক্ষে সেটা খুবই সহজ। সাপের এই বৈশিষ্ট্যটা গড়ে উঠেছে বহু যুগ ধরে খাদ্য গ্রহণের পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেবার উপায় হিশেবে: কবলে পড়া জন্তুটির হাড় ভেঙে গেলে তা চামড়া ফুটে বেরিয়ে পড়তে পারে, তাতে গেলার পক্ষে সাপের অসুবিধা হয়।

এই সাপটার সবচেয়ে মোটা অংশটার ব্যাস ছিল ত্রিশ সেণ্টিমিটার। কিন্তু যখন সে তার 'ডিনার' গিলত, তখন দিন দুয়েক পর তা দেখতে দেখতে ফুলে উঠত অবিশ্বাস্য রকমে।

চিড়িয়াখানায় পাইথনটাকে খাওয়ানো হত শুয়োর-ছানা, কখনো কখনো প্রায় একমনী এক-একটা ধেড়ে শুয়োর, কিন্তু সাপের হাঁ কীভাবে প্রসারিত হয়ে উঠছে তা দেখলে মনে হবে আরো অনেক বড়ো জন্তুও সে গিলতে পারে।

একবার মস্কো চিড়িয়াখানার একটা পাইথন গিয়ে সেঁধয় পাশের বয়স্ক কুমিরদের ডেরায়। তাদের একটাকে সে দমবন্ধ করে মেরে গোটাগুটি গিলে ফেলে। এ রকম মাত্রাতিরিক্ত খাদ্যগ্রহণে শঙ্কিত হয়ে ওঠে অনেকে, এমনকি অপারেশন করে কুমিরটা বার করার পরামর্শ দেয় ডাক্তাররা। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই পাইথন তাকে হজম করে ফেলে, হজম হয় নি কেবল শৃঙ্গজাতীয় বস্তু — কুমিরের আঁশ (খোলা) আর নখ, যা পরে পাওয়া যায় তার বাহ্যে।

যে পাইথনটাকে শুয়োর খাওয়ানো হত, সে অনায়াসে তাকে পরিপাক রসে জীর্ণ করে ফেলত: হজম হত না কেবল লোম, খুর আর দাঁতের এনামেল।

পরিপাকের দ্রুততা পুরোপুরি নির্ভর করত ঘরের তাপমাত্রার ওপর। সেটা বোঝা যায়, কেননা কুমির, গিরগিটি, কাছিমের মতো সাপের দেহেও স্থায়ী তাপমাত্রা থাকে না।

পাইথন বিষাক্ত নয়। কেউটে, তক্ষক প্রভৃতি বিষধর সাপ তাদের শিকার মারে বিষ দিয়ে, ওপরের চোয়ালের বড়ো বড়ো দুটো বিষ-ভরা সচল দাঁতের ছিদ্র (কেউটে) বা খাত (তক্ষক, গিউরজা, র‍্যাট্‌ল স্নেক) দিয়ে সে বিষ তারা নিষেক করে রক্তে। কামড় খাওয়া জন্তু কখনো কখনো পালিয়ে গিয়ে মারা পড়ে দূরে, তাহলেও সাপ তাকে খুঁজে বার করে।

সাপ প্রাণীর অনুসরণ করে চিহ্ন ধরে, তার দু'ভাগে চেরা লম্বা জিব দিয়ে মাটি আর আশেপাশের উদ্ভিদ পরখ করে করে। অনেকে ভুল করে সাপের জিবটাকে মনে
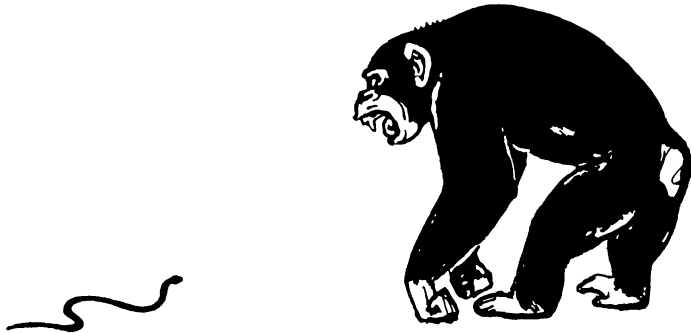
করেন 'হ্ল'। এ অঙ্গটির বেদিতা অসাধারণ বিকশিত; জিব তার ঘ্রাণশক্তির অভাব মেটায়।

চিড়িয়াখানায় গ্রীষ্মকালে আমরা ইউরোপের চলতি ঘাস-সাপগুলোকে রাখি খোলা জায়গায়। নাছোড়বান্দার মতো ব্যাঙের পেছনে তাড়া করে তারা। ঘাসের ভেতর তাদের চিহ্নের পিছু পিছু এগিয়ে শিকার ধরে কেবল তখন, যখন ব্যাঙ এত ক্লান্ত হয়ে পড়ে যে লাফাতে পারে না, কেবল ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে যায়।

সাহিত্যে মাঝে মাঝে এমন কথা লেখা হয় যে সাপ নাকি তার চোখ দিয়ে 'সম্মোহিত' করে তার শিকার। এটা কিন্তু একেবারেই ভুল। বোরো কি পাইথন সাধারণত খুরওয়ালা, তীক্ষ্ণদন্ত বা অন্যান্য প্রাণীকে আকৃষ্ট করে তাদের একান্ত নিশ্চলতা আর আঁশ-আঁশ চামড়ার ছটা দিয়ে। শিকার চোখে পড়লে পাইথন পাক দিয়ে দিয়ে গুটিয়ে গিয়ে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে, কখন তা কাছে আসবে।

প্রাণীটা ওদিকে পাইথনের চেহারায় আকৃষ্ট হয়ে অদৃষ্টপূর্ব জিনিসটাকে দেখতে থাকে এবং এত কাছিয়ে যায় যে পাইথন অব্যর্থ লক্ষ্যে দাঁত বসিয়ে মুহূর্তের মধ্যে তার পেশল পাকে তাকে জড়িয়ে ফেলে।

সাপের হাত থেকে শিকার ফসকায় কদাচিৎ, কিন্তু পেট ভরা থাকলে সে তাদের ছোঁয় না, তাই ভয়ঙ্কর শত্রুর সঙ্গে লড়াইয়ের পূর্ব-অভিজ্ঞতা এসব প্রাণীর থাকে না।

অজগরের নির্মম আলিঙ্গন থেকে পালাতে বেশি পারে বানর। সাপ দেখলেই ওরা যে ভারি সচকিত হয়ে ওঠে তাতে অবাক হবার কিছু নেই, কেননা সাপের কাছে উঁচু গাছ কোনো বাধাই নয়, আর বেশির ভাগ সাপ গাছে চাপে রাত্রে, যখন বানররা ঘুময়। যেকোনো শক্তিশালী হিংস্র জন্তুর দিকে শিম্পাঞ্জি তাকায় কোনো পরোয়া না করে, কিন্তু সাপ দেখলে আতঙ্কে তারা পালায়।

এই হল প্রাকৃতিক নির্বাচন ও নিজস্ব অভিজ্ঞতার ফল — আর সাপই হল বানরের সবচেয়ে গুরুতর শত্রু। স্বভূমিতে, আফ্রিকার গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বনে, অতি বিষধর সমেত নানাজাতীয় সাপ যেখানে প্রচুর, সেখানে পাখির বাসা আর ডিমের খোঁজে শিম্পাঞ্জিরা গাছের কোটরের দিকে এগোয় অতি সাবধানে: কেননা প্রতি কোটরেই বিষধর সাপ থাকতে পারে পাখির বদলে।

বছরকয়েক আগে বাইরে থেকে মস্কোর চিড়িয়াখানা পায় দু'টি শিম্পাঞ্জি: মর্দাটার নাম গান্স, মাদীটার — লিজা।

থাকত তারা একসঙ্গে, একই খাঁচায়। গান্সের ছিল একটা পালোয়ানী শরীর

আর জঙ্গী মেজাজ। তার আর লিজার কাছে যেতে সাহস হত না কারো, অমন ষণ্ডার সঙ্গে তামাসার ফল খুবই খারাপ হতে পারত। এদের অন্য একটা জায়গায় সরাবার প্রয়োজন যখন হল, তখন প্রমাদ গণলাম আমরা। সত্যি, হিংস্র জন্তুটার কাছে যাওয়া যায় কীভাবে, কী করে ওকে বইবার খাঁচাটায় ঢুকিয়ে নতুন 'ফ্ল্যাটে' নিয়ে যাওয়া যায়?

দরজার মুখে মুখে লাগিয়ে আমরা ওদের পরিবহণ-খাঁচাটায় ভুলিয়ে-ভালিয়ে ঢোকাবার চেষ্টা করলাম। লিজা ঢুকল আগ্রহ করেই, কিন্তু গোঁ ধরে রইল গান্স। তারপর ফুঁসে উঠল সে, ভয়ংকর গর্জন করে ছোটাছুটি করতে লাগল চারিদিকে।

আমাদের কোনো তাড়নাতেই কান দিলে না ক্ষ্যাপা জন্তুটা। তখন আমরা দমকল থেকে ঠাণ্ডা জলের তোড় ছাড়লাম, কিন্তু কোনো ফল হল না। শুধু তাই নয়, এইসব হৈচৈ আর হাঁক-ডাকে লিজাও ছটফটিয়ে উঠে ফিরে এল আগের খাঁচাটায়, দাঁড়াল গান্সের পাশে।

কিছুতেই পরিবহণ-খাঁচাটায় যেতে চাইছিল না ওরা, ক্রমেই বেশি করে ক্ষেপে উঠতে লাগল গান্স।

তখন চিড়িয়াখানার বানর-বিভাগের অধ্যক্ষ শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করলেন।

কিশোর জীববিদকে বললেন, 'একটা ঘাস-সাপ নিয়ে এসো তো।'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ক্যানভাসের থলিতে করে আনা হল সাপটাকে।

থলি থেকে সাপটার কালো দেহ দেখা যেতে না যেতেই প্রচণ্ড আতঙ্ক পেয়ে বসল অবশীভূত গান্সকে।

বিস্ফারিত চোখে সে প্রথমে আত্মরক্ষার ভঙ্গি নেয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই পেছতে শুরু করে, পা গুটিয়ে অসহায়ের মতো চেয়ে থাকে।

ছেড়ে দেওয়া হল সাপটাকে, ক্রমেই কাছিয়ে এল তা। লিজা অনেক আগেই পরিবহণ-খাঁচাটার দূর কোণে গিয়ে লুকিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত গান্সও একেবারে পড়ি-মরি ছুটল সেখানে। বন্ধ হয়ে গেল দরজা। অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হল তাদের।

নিরীহ ঘাস-সাপ দেখে এতই উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছিল গান্স যে সারা দিনটা সে পাগলা-পাগলা হয়ে থাকে।

বেচারি গান্স! কী করে ওকে বোঝাই যে ঘাস-সাপ মোটেই বিষধর কেউটে নয়, তাকে ভয় পেতে পারে কেবল ছোটো ছোটো মাছ আর ব্যাঙ?

চিহ্ন আর তাড়া

বাচ্চা দিয়েই খরগোস চটপট তার ছানাদের গা চেটে দেয়, ছানারাও তাড়াতাড়ি করে মাই খোঁজে। ভরপেট দুধ খেয়ে, খানিকটা জিরিয়ে তারা নানান দিকে ছুটে যায়, তারপর দুই, তিন, এমনকি. চার দিন পর্যন্ত ঘাসের মধ্যে বসে থাকে নিশ্চল হয়ে। এ দিনগুলোয় তারা কিছু খায় না, কেননা প্রথম বার খাওয়ার পর তাদের পেটে ঘন মাতৃস্তন্য থাকে প্রচুর, গরুর দুধের তুলনায় চর্বি তাতে ছ'গুণ বেশি। ছানাগুলো জায়গা না ছেড়ে যতক্ষণ নিশ্চল হয়ে বসে থাকছে, ততক্ষণ মা-ও তাদের খুঁজে পায় না। কেন? — জিজ্ঞেস করবেন পাঠকেরা।

ওদের একটা বৈশিষ্ট্যের ফলে শত্রুর অনুসরণ থেকে ওরা বেঁচে যায়। খরগোসের গায়ের চামড়ায় ঘামের গ্ল্যাণ্ড নেই। সেটা থাকে কেবল তাদের থাবার তলে। লাফিয়ে লাফিয়ে যাবার সময় অনিবার্যই সে গন্ধের চিহ্ন রেখে যায়, তা অনুসরণ করে সহজেই তাকে আবিষ্কার করে হিংস্র পশু। কিন্তু মাটিতে থাবা চেপে যদি বসে থাকে খরগোস, তাহলে কুকুর বা কোনো বন্য শ্বাপদই তার অস্তিত্ব টের পাবে না। আবার খরগোসকে কুকুর যত বেশিক্ষণ ধরে তাড়া করবে, ততই বেশি ঘাম বেরয় খরগোসের গ্ল্যাণ্ড থেকে আর চিহ্নের গন্ধ হয়ে ওঠে ততই জোরালো। সেইজন্যেই বহুক্ষণ আগে জোরে ছুটে যাওয়া খরগোসের পেছনে কুকুর তাড়া করে অমন একরোখা, অথচ গুপ্তস্থান থেকে সদ্য পালিয়ে যাওয়া অন্য খরগোসদের দিকে নজরও দেয় না।

গুপ্তস্থানে খরগোস-ছানাদের গন্ধ আরো ক্ষীণ হয় এইজন্যে যে প্রথম দিন কোনো মলত্যাগ করে না তারা, তাদের দেহযন্ত্র দুধটা প্রায় পুরোপুরি আত্মস্থ করে, আর চর্বি ফুরিয়ে গিয়ে যে উদ্বৃত্ত জলটা থাকে সেটা খরচা হয় শ্বাসক্রিয়ায়।

চিড়িয়াখানায় আমরা ঘাসের মধ্যে লুকিয়ে-থাকা খরগোসদের খুব কাছ দিয়ে নিয়ে যাই চেন-বাঁধা একটা পোষা শেয়ালকে। তীক্ষ্ণ ঘ্রাণশক্তি থাকলেও শেয়াল কিন্তু একবারও টের পায় নি। এই একই শেয়াল খরগোসের চিহ্ন পেতেই তৎক্ষণাৎ উত্তেজিত হয়ে ছুটে যেতে চেয়েছিল সামনে।
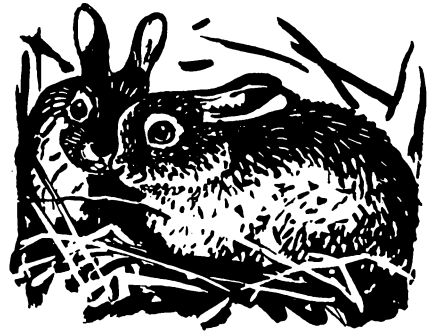
খরগোসের থাবার গ্ল্যান্ড থেকে নিঃসৃত চর্বি-ঘাম যদি-বা হিংস্র পশুর কাছে তাকে ধরিয়ে দেয়, তাহলেও তাড়াতাড়ি যাবার সময় তাই আবার সাহায্য করে তাকে, এতে ঘন লোমে ঢাকা পায়ের পাতায় কাদা বা তুষার লেপটে যায় না, দ্রুত ছুটতে সুবিধা হয় তার ফলে।

এইখানে শেয়ালের চিহ্ন নিয়েও কয়েকটা কথা বলা যাক। প্রত্যেক শিকারীই জানে যে কুকুর আর শেয়ালের পায়ের চিহ্ন খুবই পৃথক। তুষারের ওপর কুকুরের পায়ের চিহ্ন পড়ে খুব সুস্পষ্ট, পায়ের ন্যাড়া তলি আর আঙুলের চড়া দাগ থাকে তাতে। শেয়ালের পায়ের ছাপ কিন্তু অনেক আবছা। তার কারণ, শেয়ালের পায়ের পাতা লম্বা লম্বা ঘন লোমে ঢাকা, তার ফলে শীতকালে সে যায় যেন ফেল্ট-বুট পরে।

এই বৈশিষ্ট্যের ফলে শেয়ালের থাবা জখম হয় না কখনো, এমনকি কড়া তুষারের চাঙড়ে ঠোকর খেলেও হয় না। কিন্তু একই মাঠে কুকুর দৌড়ে গেলেই তাদের পায়ের দাগে রক্ত দেখা যাবে। তবে শেয়ালের জীবনেও দুঃসময় আসে বৈকি। অগস্টের শেষ ও সেপ্টেম্বরে লোম পাল্টাবার সময় তার পায়ের তলির লোম উঠে যায়, এবং তার স্বাভাবিক ক্ষিপ্রতা হারায় সে। তারপর লোম উঠতে শুরু করে পায়ের তলিতে। প্রথমটা তা হয় খোঁচা খোঁচা, কড়া। তখন শেয়াল হাঁটে যেন পেরেকের ওপর দিয়ে, শিকারীরা যা বলে, 'তার থাবা বাঁচিয়ে চলে'। এ সময় বেশিক্ষণ দৌড়তে পারে না শেয়াল, এমনকি বেজাত কুকুর তাকে ধরে ফেলতে পারে।

এর দিন ত্রিশেক পর পায়ের তলিতে লোম বেড়ে ওঠে, বেঁকে গিয়ে তা ঢেকে ফেলে থাবাকে, তখন শেয়ালের বিপদের দিন শেষ।
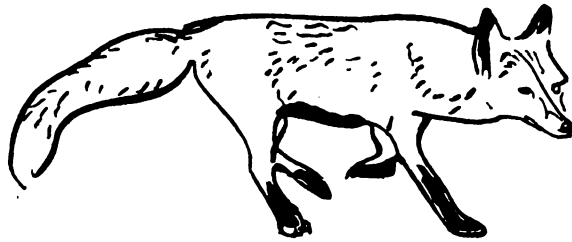
নুনের খিদে

মস্কোর আশেপাশের পাড়া থেকে প্রায়ই পাখি উড়ে আসে চিড়িয়াখানায়। বেশি আসে চড়ুই, মাঝে মাঝে সিসকিন, লিনেৎ, বুলফিঞ্চের ভ্রাম্যমাণ ঝাঁক। পশুদের খাবার জায়গায় যেতে চায় তারা, যদিও খাবার জোটে নি, এমন নয়। সবচেয়ে বেশি করে তাদের টান নুনে, খুরওয়ালা জন্তুদের খাবার জায়গায় তা সাধারণত থাকে বড়ো বড়ো দানায়।

প্রকৃতি আমাদের কাছে মনে হয় বেশ সুসমঞ্জস, কিন্তু আসলে তাতে গরমিলও আছে। যেমন, বন্য অবস্থায় উদ্ভিদ্‌ভোজী অধিকাংশ প্রাণীরই নুনের খিদে মেটে না। তামারিস্ক ঝোপের পাতা থেকে নোনতা শিশির চাটতে কিংবা কোনো নোনা ভুঁই পেয়ে গেলে তা আঁকড়ে ধরতে আমরা স্থলচর কাছিমদের দেখেছি একাধিকবার। গরু-ভেড়া-ছাগল-ঘোড়া নুন চাটে সাগ্রহে। শীতকালটা বিনা নুনে কাটাবার পর হরিণের পাল গ্রীষ্মে ছোটে নোনা ভুঁইয়ে, গভীর গর্ত করে দেয় তাতে।

একবার চিড়িয়াখানায় উটপাখিদের দিকে আমি এক মুঠো নুন ধরেছিলাম। চঞ্চল হয়ে তারা তা লুফে নেয়, তারপর থেকে যতবার আমি ওদের কাছাকাছি দিয়ে গেছি ততবারই ছটফট করেছে তারা। কাঠ-বেড়ালি, খরগোস, মেঠো ইঁদুর — সবারই নুন দরকার।

নিজেদের 'নির্মল' রক্ত লবণাক্ত করার জন্যে প্রায়ই জায়গা বদল করতে হয় বন্য জন্তুদের। এল্‌ক্‌ হরিণ, উত্তরী হরিণ প্রভৃতি অনেক জন্তু লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে পৌঁছয় সমুদ্র তীরে, তরঙ্গ-ভঙ্গের পর যে নোনা ফেনা পড়ে থাকে, সেটা চাটে।

মাংসাশী জন্তু ছাড়া প্রায় সব প্রাণীই নুনের অভাব বোধ করে, সেটা না জুটলে দুর্বল হয়ে পড়ে তারা, খিদে কমে যায়।

হিংস্র পশুর নুনের খিদে নেই, কেননা যেসব তৃণভোজীদের তারা খায়, তাদের মাংস, হাড়, রক্ত থেকেই প্রয়োজনীয় নুন পায় তারা।

তৃণভোজীদের ভিন্ন ব্যাপার। তাদের খাদ্য উদ্ভিদ। কিন্তু উদ্ভিদে সোডিয়ম ক্লোরাইড (অর্থাৎ খাবার নুন) কম, কেননা উদ্ভিদের শিকড় মাটি থেকে বেছে বেছে পটাশিয়ম লবণ আহরণ করে। খেতে যে সার দেওয়া হয়, সেটাও সোডিয়ম নয়, পটাশিয়ম লবণ। উদ্ভিদ্‌ভোজী প্রাণী যখন নোনা ভুঁইয়ে এসে খাবার নুন বা সোডিয়ম সালফেট চেটে খায়, তখন সোডিয়ম লবণ তাদের রক্ত থেকে উদ্বৃত্ত পটাশিয়ম নিষ্কাশন করে, বেরিয়ে আসে তা প্রস্রাবের সঙ্গে। এইজন্যেই বনে, কৃত্রিম লবণস্থলে সাগ্রহেই এসে জোটে এল্‌ক্‌ হরিণ, রো হরিণেরাই শুধু নয়, খরগোস, কাঠ-বেড়ালি, ইঁদুর, আর উত্তরের বনে আসে লেতিয়াগাও। এদের সবারই ঘাটতি পড়ে খাবার নুনে, তা নইলে রক্তের বিন্যাস হয় অস্বাভাবিক, আর পাকস্থলীর পাচক রসে প্রয়োজনীয় হাইড্রো-ক্লোরিক অ্যাসিড মেলে না। নুন ছাড়া প্রাণীরা হয়ে পড়ে মরকুটে, প্রায়ই নানা রকম ব্যাধি দেখা দেয় তাদের। উদ্ভিদ্‌ভোজী প্রাণীদের জন্যে নুনই যে সবচেয়ে ভালো টোপ, তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

বিপদের সংকেত

নিচু দিয়ে, চিড়িয়াখানার গাছগুলোর মাথা প্রায় ছুঁই-ছুঁই করে উড়ে যাচ্ছে এরোপ্লেন, পার্টিশনের ওপারে লাইনের ওপর দিয়ে ঘড়ঘড়িয়ে চলেছে ট্রাম, গোঁ-গোঁ করছে, হর্ন দিচ্ছে মোটর। কিন্তু চিড়িয়াখানার খোঁয়াড় আর খাঁচায় কোনোই চাঞ্চল্য নেই। এখানকার পোষ্য হবার পর সমস্ত প্রাণীই চট করে অভ্যস্ত হয়ে যায় শহরের কোলাহলে, সব রকমের চড়া শব্দে। কিন্তু প্রাকৃতিক পরিস্থিতিতে যেসব শব্দ সাধারণত বিপদের আসন্নতা বোঝায়, তাতে বন্য জন্তুরা সর্বদাই সচকিত হয়ে ওঠে, এমনকি জন্ম থেকে যারা চিড়িয়াখানায় মানুষ হয়েছে তারাও।

কাক কাছে এলে ভূমিচর পাখির ছানাদের তেমন ভয় হয় না। কিন্তু হিংস্র জন্তু দেখলে কাক যে ধরনের কা-কা ডাক ছেড়ে নির্ভয়ে তার দিকে ঝাঁপিয়ে যায়, সে ডাক শোনা মাত্রই প্যাট্রিজ, হাঁস, তিতিরের ছানারা চট করে যেখানে পারে লুকিয়ে পড়ে। এইসব ছানাদের কিছুটা কাক ধ্বংস করে নিজেই, তাহলেও বেশির ভাগ ছানাদের সে বাঁচায় তার ডাক দিয়ে, তাতে যেন পক্ষিজগতকে সে সাবধান করে দেয় যে তাদের পক্ষে বিপজ্জনক কোনো নেকড়ে, শেয়াল বা বাজপাখি কাছিয়ে আসছে।

যদি শোনা যায় ছাতার পাখির বৈশিষ্ট্যসূচক ঝিং-ঝিং ডাক, তাহলে বড়ো বড়ো জানোয়ারেরাও তাড়াতাড়ি আত্মগোপন করে, কেননা ছাতার পাখি সাধারণত এ হুঁশিয়ারি দেয় বনে মানুষ এলে।

টম-টিটের প্রায় শোনা যায় না এমন মিহি চিঁচিঁ শব্দও সবাই ধরে বিপদের সঙ্কেত ব'লে; শুধু গায়ক পাখিরাই নয়, উড-গ্রাউজও সে সময় ডালে এসে বসে থাকে নিশ্চল হয়ে। বাজপাখির হুঁশিয়ারি দেয় টম-টিটের চিঁচিঁ। চিত্র-বিচিত্র কাঠ-ঠোকরাকেও বাঁচায় তা, নিজের কাজে একান্ত নিমগ্ন থাকলেও সঙ্কেত শোনা মাত্র সে চটপট আক্রমণ এড়ায়, কেননা টম-টিট সাধারণত পাক খায় তার 'কামারশালার' কাছেই।

নিশ্চিন্তে আঙিনায় চড়ছে গোটাদশেক হলদে-হলদে, রোঁয়া-রোঁয়া, অনভিজ্ঞ মুরগী-ছানা। এমন সময় মাথার ওপর পাক দিতে লাগল চিল। তাকে দেখে প্রথম হুঁশিয়ারি দিল মোরগ — 'খুউ-উ', তারপর মুরগী — 'ক্রিউ!' অমনি ছানার দল লুকিয়ে পড়ল ঝোপের মধ্যে কিংবা মায়ের ডানার তলে।

কেন পরিত্রাণ লাভের চেষ্টা করে ছানাগুলো? শিকারী পাখির নখরের প্রচণ্ড ছোঁ তো তারা আগে কখনো দেখে নি!

ডানাওয়ালা অথবা চতুষ্পদ — উভয় রকমের হিংস্র শত্রুর বিরুদ্ধে পাখিদের আত্মরক্ষা করে আসতে হয়েছে বহু বহু হাজার বছর ধরে। এ সংগ্রামে টিকে থেকেছে কেবল তারা, যারা পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে বিভিন্ন হিতকর গুণ উত্তরাধিকার হিশেবে রপ্ত করতে পেরেছিল। এক্ষেত্রে মায়ের প্রথম বিপদ-সঙ্কেতেই লুকিয়ে পড়ার প্রতিবর্ত ক্রিয়াটা হল সেই গুণ। আকাদমিশিয়ান ইভান পেত্রভিচ পাভলভ একে বলেছেন অনপেক্ষ প্রতিবর্ত, কেননা নির্দিষ্ট কতকগুলি পরিস্থিতিতে তা প্রতিবার অবশ্যই ঘটবে, এবং এ আচরণ তার জন্মগত।

একবার চিড়িয়াখানার কিশোর জীববিদদের আমরা এটা দেখাই হাতে-কলমে। ৪৭ দিন ধরে ইনকিউবেটরে ছিল অস্ট্রেলীয় উটপাখি এমু'র ডিম। দু'দিন পরে তাদের ফোটার কথা। তখনই কান পেতে তাদের সমান তালের সামান্য নিঃশ্বাসের শব্দ ধরা যাচ্ছিল।

ডিমগুলোকে বার করে আমরা তা একটা কাচের ওপর রাখি। যেখানে রেখেছিলাম সেখানেই রইল তারা, শুধু মাঝে মাঝে অলক্ষ্যে কেঁপে কেঁপে উঠছিল। তখন আমি মদ্দা এমু'র বিপদ-সঙ্কেতের ডাক নকল করে ছোট্ট একটু গর্জন করলাম:

'ব্‌র-র-র...'

অমনি কেঁপে উঠে গড়াতে লাগল ডিমগুলো, কেননা ভেতরকার তখনো না-ফোটা বাচ্চাগুলো পা নাড়াতে শুরু করে, যেন 'বিপদ' থেকে আত্মরক্ষার জন্যে ছুটছে।

'সে কী?' জিজ্ঞেস করলে ছেলেরা। 'আমাদের এমু-ছানাগুলো তো ইনকিউবেটরে ছিল, বাপ-মায়ের ডাক তো কখনো শোনে নি?'

বললাম, 'সেই তো ব্যাপার! বাপ-মায়ের বিপদের সঙ্কেত শুনে ছানারা তাড়াতাড়ি লুকিয়ে পড়তে চায় এইজন্যে নয় যে তারা হিংস্র জন্তুর নখের স্বাদ আগেই পেয়েছে, ফলে বাস্তব অভিজ্ঞতা বা সাপেক্ষ প্রতিবর্ত গড়ে উঠেছে তাদের। না, এটা হল জন্মগত, অনপেক্ষ প্রতিবর্ত, পেয়েছে তা বংশ ধারায়। এমু'র বংশধরদের টিকে থাকার জন্যে তা দরকার, ছানাদের আত্মরক্ষা প্রতিক্রিয়া এটা, প্রাকৃতিক নির্বাচনে তা বংশগতিতে নিহিত হয়ে গেছে।'

এখানে যে পরীক্ষাটার কথা বললাম, তা সবার পক্ষেই করা সম্ভব। বাচ্চা ফোটার দিন দুই আগে সাধারণ মুরগীর ডিম নিলেই চলবে। শুধু বিপদের সময় মুরগী-মা যে রকম ডাকে, সেই ডাকটি রপ্ত করতে হবে। ফল হবে এমু'র ডিমের মতোই।

তবে সময়মতো বিপদ-সঙ্কেতে কেবল পাখিরাই বাঁচে না। দল বেঁধে যারা থাকে এমন অনেক প্রাণীই সাড়া দেয় তাতে। কিছু দৃষ্টান্ত দিই।

আলতাই পাহাড়ে একজন শিকারতত্ত্ববিদ মারমটজাতীয় মূষিকদের আচরণ লক্ষ্য করছিলেন, ঘাস ছিঁড়ছিল তারা, নয়ত রোদ পোয়াচ্ছিল। বড়ো একটা পাথরের আড়াল থেকে জোরালো দূরবীনে তিনি দেখলেন যে একদল আরখার বা বড়ো বড়ো পাহাড়ী ভেড়া যাচ্ছে তাদের দিকে। মারমটদের কোনোই ভাবান্তর হল না তাতে। মারমট বসতির মাঝখানে গিয়ে ভেড়াগুলো শুয়ে পড়ল ঘাসের মধ্যে এবং অচিরেই আধমনী শিং সমেত মাথা মাটিতে রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। সাধারণত আরখাররা ঘুমোয় না, কেবল ঝিমোয়, সর্বদাই থাকে সতর্ক; কান নাড়ায়, ঘাড় ঘোরায়, কেবলি জেগে জেগে ওঠে। এখানে কিন্তু ভেড়াগুলো ঘুমোতে লাগল একেবারে মরার মতো। শেষ পর্যন্ত জায়গাটা ছেড়ে যাবার সময় হল শিকারতত্ত্ববিদের আড়াল থেকে বেরতেই মারমটদের চোখে পড়ে গেলেন তিনি, অমনি তীক্ষ্ন শব্দে ভরে উঠল বাতাস — শিস দিতে লাগল গোটা বসতিটা। বিপদের এই সঙ্কেত

পেয়েই ভেড়াগুলো লাফিয়ে উঠে ছুটতে লাগল পাহাড়ের ওপর দিকে। বোঝা গেল, এই বন্য জীবগুলোর সত্যিকারের ঘুমের সুযোগ বিশেষ হয় না — নেকড়ে, তুষার-চিতা প্রভৃতি জন্তুরা থাকে ওঁৎ পেতে। শুধু বিশ্বস্ত পাহারাদার মারমটদের মধ্যেই নিশ্চিন্তে ঘুমতে পারে তারা।

একবার সন্ধ্যায় আমি কালো থ্রাশের হুঁশিয়ারি ডাক শুনলাম 'চেন্-চেন্-চেন্'... ধীরে ধীরে বনের কিনারার দিকে এগুতে এগুতে সে যেন গোটা বনটাকেই সাবধান করে দিচ্ছিল। দ্রুত এবং নিঃশব্দে আমি হাওয়ার বিপরীতে বনের হাঁটা-পথে গিয়ে দাঁড়ালাম। কলরব কাছিয়ে আসছিল, বেশ ঠাহর হচ্ছিল রবিন পাখির 'ক্রুদ্ধ' কিচির-মিচির। মোড় থেকে ধীরেসুস্থে বেরিয়ে এল নেকড়ে, আর পাখিগুলো ডাল থেকে ডালে উড়ে আসছে তার পেছন পেছন। গুলি করতেই নেকড়েটা পড়ে গেল, শিগ্গিরই থেমে গেল বনের সোরগোল।

মর্‌র জাহাজ

ন্যায্যতই উটের নাম 'মর্‌র জাহাজ', শত শত বছর ধরে সে ছিল নির্জলা মর্‌ভূমির আতপ্ত বালি অতিক্রমের একমাত্র উপায়।

আশ্চর্য তার সহ্যশক্তি। পেট প্‌রে একবার ভালো খাবার পেলে সে তার কুঁজে প্রচুর চর্বি জমিয়ে রাখে, তারপর জল বা খাবার না খেয়ে সে মর্‌ভূমিতে চলতে পারে দশ দিন কি আরো বেশি। সত্যি, উটের কুঁজ হল দ্‌ই শতাধিক কিলোগ্রাম চর্বির ভাঁড়ার।

জলহীন বালি দিয়ে কারাভান চলছে এক সপ্তাহ, উটের খাবার মতো জল নেই কোথাও। উট কিন্তু দিব্যি এগিয়ে যায়, তেষ্টা নেই, কাহিল লাগে না তার। শ্‌ধ্‌ কুঁজ তার দিনে দিনে ছোটো হয়ে আসে। কোত্থেকে এই সহ্যশক্তি, লোকে বহ্‌দিন ভেবে পায় নি। অনেক আষাঢ়ে গল্প আছে তাকে নিয়ে। এমনকি এও বলা হত যে উট দীর্ঘ যাত্রা আগে থেকেই টের পায়, তাই কারাভান রওনা দেবার আগে সে অস্বাভাবিক পরিমাণ জল খেয়ে নেয়, তা জমা থাকে তার জটিল পাকস্থলীর প্রথম দ্‌ই বিভাগে। বলাই বাহ্‌ল্য, এটা নেহাৎ গপ্পো। মধ্য এশিয়ার মর্‌জীবন পর্যবেক্ষণ করার সময় আমরা একাধিকবার উটের দেহ ব্যবচ্ছেদ করেছি, কিন্তু তার পাকস্থলীতে কিছ্‌ ঝাঁঝালো দ্‌র্গন্ধী তরল পদার্থ ছাড়া আর কিছ্‌ আমরা কখনো দেখি নি, আর পশ্‌দের ক্ষেত্রে যা হয়, তাতে কিলবিল করেছে কেবল ইনফিউজোরিয়া আর বীজাণ্‌।

‘কিন্তু “মরুভূমির জাহাজ” জল পায় কোত্থেকে?’ জিজ্ঞেস করবেন পাঠকেরা। জল পায় উট তার কুঁজ থেকে। উপোস দেবার সময় তার চর্বি গলে (পুড়ে) গিয়ে যেসব জিনিস তৈরি হয়, তা থেকে আসে জল। আর সে জল হয় তার সঞ্চিত চর্বির চেয়ে ওজনে বেশি। কেননা নিঃশ্বাস নেবার সময় বাতাস থেকে যে অক্সিজেন ফুসফুস হয়ে রক্তে সঞ্চারিত হয়, তাও গিয়ে সংযোজিত হয় তার গলা চর্বির সঙ্গে। সাধারণ গরুর চর্বি যদি ধরি, তাহলে দেখা যায় যে তার ১০০ ভাগ বিশ্লিষ্ট হলে পাওয়া যায় গড়ে প্রায় ১১২ ভাগ জল আর ১৮২ ভাগ কার্বনিক অ্যাসিড। চর্বি গলে যাওয়ার ফলে যে শক্তি ছাড়া পায় তাতে তপ্ত বালিতে কারাভানের সঙ্গে যাওয়াতে উটের অসুবিধা হয় না।

উটের পাকস্থলীর প্রথম দুই বিভাগের, ‘পকেট’ ও তথাকথিত ‘কূপে’ যে অল্প পরিমাণ শ্লৈষ্মিক তরল পদার্থ সর্বদাই পাওয়া যায়, সেটা কোনোক্রমেই উটের দেহযন্ত্রে জলের খরচা পোষাতে পারে না। তাতে থাকে ইনফিউজোরিয়া আর জীবাণু, এক ধরনের খমিরের কাজ করে তারা। খাদ্যের দ্রুত পিণ্ড-পরিণতিতে তা সাহায্য করে,
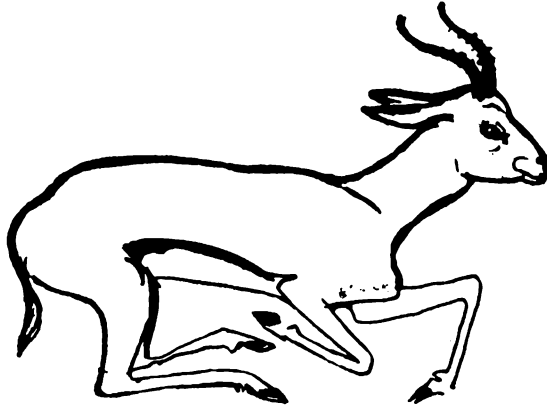
গাঁজিয়ে তোলে খাদ্য। আর ইনফিউজোরিয়া আর জীবাণুরা নিজেরাই বংশবৃদ্ধি করে বিপুল পরিমাণে: ঢেকুর তোলার পর তা জীর্ণ হয়ে যায় তার পাকস্থলীতে (অন্যান্য রোমন্থক প্রাণীর মতো), ফলে পাওয়া যায় প্রয়োজনীয় দামী আমিষ প্রোটিন।

মরুভূমিতে বহু সহস্র বছরের জীবনে উটেরা সেখানকার বিশেষ পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছে।

যেমন, দেখা যায় উটের পায়ে এবং অন্যান্য জায়গায় বড়ো বড়ো কড়া। বেখাপ জুতো পরলে যে কড়া পড়ে এটা মোটেই তেমন নয়। আসলে মরুভূমিতে রোদে খুবই তেতে ওঠে বালি, তাতে বসলে চামড়া পুড়ে যেতে পারে।

দেহের যেসব অংশে ভর দিয়ে উট শোয়, তা পুড়ে যাবার বিপদ থেকে তাকে রক্ষা করে এইসব কড়া।

জল আর খাদ্য ছাড়া দুম্বাও মরুভূমি পাড়ি দিতে পারে। সেটা সে পারে তার লেজ আর পাছায় সঞ্চিত চর্বির দৌলতে। কিন্তু মরুভূমিতে জাইরান হরিণ বা বুনো ছাগলও থাকে, যাদের মজুত চর্বি নেই উটের মতো। তাদের জীবন অনেক কষ্টকর। খাদ্য ও জলের অভাব থেকে জাইরানদের বাঁচায় কেবল তাদের পা, এইসব লঘু প্রাণীরা এতই ক্ষিপ্র যে ঝর্ণায় জল খাবার জন্যে তারা দৌড়ে যেতে পারে কয়েক ডজন কিলোমিটার। খাদ্যের সন্ধানে তারা বহুদূর পেরিয়ে উপযুক্ত চারণভূমি বার করে।

লম্ফবিশারদ চতুষ্পদ

কয়েক বছর আগে মস্কোর চিড়িয়াখানা থেকে পালিয়ে যায় সাইবেরীয় ছাগল। ছুটে গিয়ে অনায়াসে সে ডিঙিয়ে যায় তিন মিটার উঁচু বেড়া, দৌড়ে বেড়ায় শহরের রাস্তায়। ছেলেপুলেদের শিস আর লেলানিতে জন্তুটা দৌড়ে, মোটরগাড়িকে হারিয়ে ট্রামগাড়ির একেবারে মুখের ওপর দিয়ে পেরিয়ে যায় রাস্তা। অবিলম্বে আমরা তাকে ধরার তোড়জোড় চালালাম। কিন্তু লোকেদের চেয়ে ছাগলটার দ্রুততা ও ক্ষিপ্রতা অনেক বেশি: মানুষে ছুটছিল ফুটপাথ দিয়ে আর ও যাচ্ছিল বেড়া ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে।

দু'দিন আমরা ফেরারীর কোনো সন্ধানই পেলাম না। তৃতীয় দিন টেলিফোন এল চিড়িয়াখানায়:
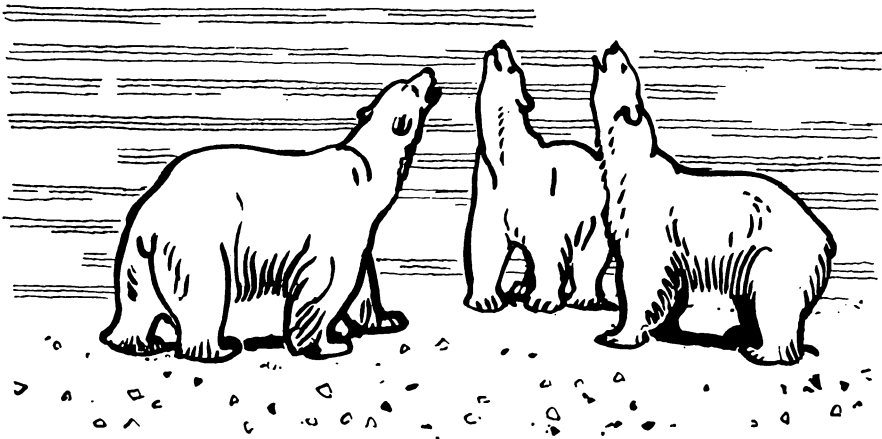
'থানা থেকে বলছি। আপনাদের বুনো ছাগলটাকে একদল ছেলে তাড়া করে বেড়াচ্ছে গোর্কি রাস্তায়। লোক পাঠান।'

চিড়িয়াখানার লোকেদের আর দু'বার বলতে হল না। বলশায়া গ্রুজিনস্কায়া রাস্তায় তারা ছাগলের পথ আটকাল। কিন্তু বড়ো একটা চুল ছাঁটার সেলুনের খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে গেল ছাগলটা। সেখানে ঠিক দরজার সামনেই দেয়ালে টাঙানো ছিল আয়না। প্রাণপণে ছাগলটা তাতে ঢুঁ মারল, ঝনঝনিয়ে ছড়িয়ে পড়ল কাচের টুকরো।

দুর্ভাগা আয়নাটার সামনে যে লোকটা বসেছিল ককিয়ে উঠল সে, 'ওরে বাবা! হতচ্ছাড়া কোথাকার!'

আর নাপিত কেদারাটার দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল: মুহূর্তের মধ্যে উধাও হয়ে গেছে তার খদ্দের, যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। শুধু পরে, সব যখন শান্ত হয়ে আসে, সেলুন থেকে বার করে আনা হয় ছাগলটা, তখন খদ্দেরকে খুঁজে পাওয়া যায় এক কোণে, গা ঢাকবার একগাদা কাপড় আর তোয়ালের মধ্যে...

কিন্তু ছাগলটা চিড়িয়াখানা থেকে পালাতে পারল কী করে?

আসলে, যে তিন মিটার উঁচু বেড়া এদের বহির্জগৎ থেকে আলাদা করে রাখে, সেটা কেবল একটা আপেক্ষিক বাধা মাত্র। খোঁয়াড়ের অভ্যস্ত পরিবেশে বন্দিশায় যে সাপেক্ষ প্রতিবর্ত গড়ে ওঠে, সেইটাই সাধারণত এদের আটকে রাখে, শহরের রাস্তায় অবাধে ঘুরে বেড়াতে দেয় না। চিড়িয়াখানার নতুন এলাকায় যে দাগেস্তানী পাহাড়ী ছাগল আছে, তারা ছুটে এসে তাদের বেড়া ডিঙিয়ে যেতে পারে অনায়াসে, আর এসব বেড়াও হয় সাড়ে তিন মিটার উঁচু। সমান নৈপুণ্যে এরা লাফিয়ে ওঠে বাড়ির ছাদে, দেয়ালের সামান্য বন্ধুরতাও আঁকড়ে ধরে খুর দিয়ে।

একবার এই রকম একটা ধাড়ী মদ্দা ছাগলকে আমরা তার বাসার ভেতরে ঢোকাবার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু ছাগলটা হঠাৎ বিরাট এক লাফ দিয়ে বেড়া আর জল-ভরা পরিখা ডিঙিয়ে... গিয়ে পড়ল শ্বেত ভল্লুকদের চত্বরের মাঝখানে।

একটু ঘাপটি মেরে উত্তর মেরুর জানোয়ারগুলো ছাগলটার দিকে ছুটে এল, কিন্তু থেমে গেল হতভম্ব হয়ে: একেবারে ওদের নাকের ডগার সামনে থেকে প্রায় না ছুটে বোঁ করে ছাগলটা লাফিয়ে উঠল ছয় মিটার উঁচু এবড়ো-খেবড়ো দেয়ালে, মর্মর মূর্তির মতো স্থির হয়ে রইল তার মাথায়।

কিন্তু ফুটকিদার হরিণ যে লাফ দিতে পারে তার তুলনায় এগুলো মনে হবে কিছুই নয়। অন্যান্য শহরের চিড়িয়াখানায় পাঠাবার জন্যে একবার আমাদের চিড়িয়াখানায় গোটা কয়েক ফুটকিদার হরিণ ধরার চেষ্টা হচ্ছিল। সংকীর্ণ একটা প্রবেশপথ গিয়েছিল খাঁচা পর্যন্ত; ধীরে ধীরে সেইদিকে হরিণগুলোকে হঠিয়ে নিয়ে আসছিল নীরন্ধ্র একসারি লোক। হঠাৎ গোটা পালটা ঘুরে পেছিয়ে গেল। পরের মুহূর্তে একটা হরিণ পেছনের পায়ে সামান্য বসেই লাফ দিয়ে চলে গেল লোকেদের মাথা ডিঙিয়ে। তার পেছু পেছু বাকি ১৪টা হরিণও লাফ দিলে। সে এক বিরল দৃশ্য! দুটো হরিণ ছিল চত্বরের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায়। লাফ দিলে তারা একই সময়ে। কোনাচে মেরে লাফ দেওয়ায় দ্রুত কাছিয়ে আসতে লাগল তারা। মুহূর্তের মধ্যে শূন্যে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে গেল বলের মতো। পরের মুহূর্তে যেন কিছুই হয় নি, এমনি ভাব করে তারা গিয়ে দাঁড়াল মাঠটায়, আগের মতোই শঙ্কিত দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে লাগল লোকেদের।

আলগা মাটিতে খুরের যে দাগ পড়েছিল তা থেকে আমরা হরিণদের লাফের দৈর্ঘ্য মাপি। দেখা গেল এই লম্ফবিশারদ চতুষ্পদেরা লাফ দিয়েছে প্রায় এগারো মিটার!

বাঘে যতটা লাফ দিতে পারে বলে শোনা যায়, সেটা খুবই অতিরঞ্জিত। কেউ কেউ এমনও বলেন যে লম্বায় দশ মিটার কি আরো বেশি লাফ দেয় তারা। তবে এমনকি ঢালুর মুখেও এতটা ঝাঁপ বিশ্বাসযোগ্য নয়। চিড়িয়াখানার সমতল চত্বরে বাঘ কখনো ছয় মিটারের বেশি লাফ দেয় নি।

তাহলে উসুরি বাঘ ফুটকিদার হরিণ শিকার করতে পারে কেমন করে? কারণ হরিণের দিকে চুপিচুপি ওঁৎ পেতে এগিয়ে এসে বাঘ শুধু লাফই দেয় না, সেইসঙ্গে এমন ভয়ংকর গর্জন করে যে হরিণ একেবারে অবশ হয়ে যায়। দূর প্রাচ্যের শিকারীরা বহুবার লক্ষ্য করেছে যে হরিণ অনায়াসে লাফ দিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারত, কিন্তু বাঘের বীভৎস গর্জনের পর সে একেবারে জায়গাটার সঙ্গে যেন গেঁথে যায়, ঘন ঘন এলোমেলো পা নাড়াচাড়া করে শুধু। এইভাবেই নেকড়ের অতর্কিত আক্রমণে মারা পড়ে রো হরিণ, স্তেপের কৃষ্ণসার মৃগ, যদিও দ্রুত ছুটে অনায়াসে আত্মরক্ষা করতে পারে তারা।

পার্সেল

পার্সেলটা এসেছিল নভোসিবির্স্ক থেকে। এ শহরের পশুদ্যানের কিশোর জীববিদরা তা পাঠায় তাদের মস্কো সহযোগীদের কাছে।

সাগ্রহে কাঠের প্যাকিং বাক্সটা খুলতে লাগল ছেলেরা: সবারই ইচ্ছে তাড়াতাড়ি দেখে ভেতরে কী আছে। অবশেষে ঢাকনা খোলা হল, দেখা গেল দুটো ক্রুসিয়ান মাছ। পড়ে আছে একেবারে নিশ্চল হয়ে। মনে হল মারা গেছে।

যে বাক্সে মাছ পাঠানো হয়েছিল তার ছিল দু'দফা পাটাতন। মস্কোয় পাঠাবার সময় নভোসিবির্স্কের ছেলেরা তার ফাঁকে বরফ ভরে দিয়েছিল। কিন্তু আসতে আসতে বরফ গলে যায়, জল বেরিয়ে যায় ফাটল দিয়ে।

মাছদুটোকে রাখা হল জলে। এক ঘণ্টা পরে একটা মাছ কানকো নাড়িয়ে নিঃশ্বাস নিতে লাগল। কিছুক্ষণ পর গামলার জলের মধ্যে সাঁতরাতেও শুরু করল সেটা। দ্বিতীয় মাছটা কিন্তু মারা গিয়েছিল।

নভোসিবির্স্ক থেকে মস্কো পর্যন্ত পাড়ি দিয়ে এসে যে মাছটা পুনর্জীবিত হল, দুঃখের বিষয় তার গায়ে দেখা গেল শয্যাক্ষত। পার্সেল পাঠাবার সময় কিশোর প্রকৃতিবিদরা যদি বুদ্ধি করে বাক্সে নরম তোষকের মতো কিছু পেতে দিত, তাহলে এটা ঘটত না।

মস্কো কমরেডদের কাছে চিঠিতে নভোসিবির্স্কের ছেলেরা জানিয়েছে যে তারা বহুদিন থেকে বিনা জলে মাছ বাঁচিয়ে রাখার পরীক্ষা চালাচ্ছে। লিখেছে, ‘এভাবে আমরা মাছ বাঁচিয়ে রেখেছি এগারো দিন পর্যন্ত। সব সময় আমরা তাপমাত্রা
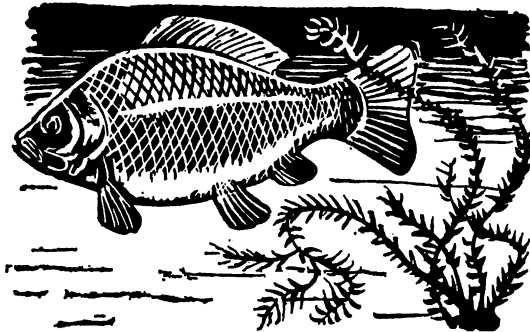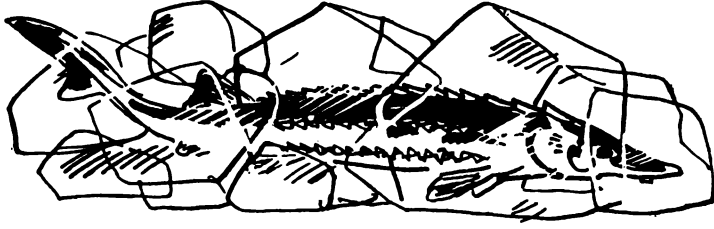
রেখেছি শূন্য ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেডে। এগারো দিন পরে মাছ জলে ছাড়লে তা ফের বেঁচে উঠেছে।'

মস্কো চিড়িয়াখানার কিশোর জীববিদরাও ঋণী হয়ে রইল না — নভোসিবির্স্ক পশূদ্যানে পার্সেল পাঠাল তারা। তাতে ছিল কয়েকটা সোনালী মাছ। এই সুদূর অস্বাভাবিক যাত্রায় তাদের পাঠাবার আগে ছেলেরা একটা পরীক্ষা চালায়। মাছগুলোকে একটা কৌটোয় পুরে তিন দিন ধরে তা রাখে বরফের মধ্যে। বাহাত্তর ঘণ্টা পরে জলে ছাড়ায় তারা আবার বেঁচে ওঠে।

কিশোর প্রকৃতিবিদদের এই পরীক্ষাটার ব্যবহারিক তাৎপর্য অনেক। জলের মধ্যে রেখে জীবন্ত মাছ আমদানি করা খুব জটিল ব্যাপার, সব সময় তা সম্ভবপরও নয়। পরিবহণের এ পদ্ধতিতে প্রায়ই ধাক্কা লেগে মাছেদের গা ছড়ে যায় খুব। মাছকে বাঁচিয়ে রেখে শুকনো প্যাকেটে পাঠানো অনেক সহজ।

মস্কো আর নভোসিবির্স্কের ছেলেদের মধ্যে পার্সেল বিনিময়ের পর আমরা খবর পেলাম যে রেফ্রিজারেটর শিল্পের লেনিনগ্রাদ ইনস্টিটিউটেও একই রকম পরীক্ষা চলছে। আমাদের কিশোর জীববিদদের মতো সেখানেও পুনরুজ্জীবন সম্ভব হয়েছে কেবল সেইসব ক্ষেত্রে যেখানে ঠাণ্ডায় জমানো হয়েছে কেবল মাছের গায়ের ওপরের স্তরটা। সে সময় মাছ থাকে তথাকথিত অ্যানাবিওসিস, বা 'আপাত-মৃত্যুর' অবস্থায়।

লেনিনগ্রাদ ইনস্টিটিউটে বরফ দিয়ে মাছেদের ঠাণ্ডা করা হয় শূন্য ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড পর্যন্ত। ল্যাবরেটরিতে ছোটো ছোটো কার্প মাছ নিয়ে পরীক্ষা করার পর ইনস্টিটিউটের কর্মীরা বড়ো বড়ো মাছ নিয়ে শুরু করেন। আস্ত্রাখানের কাছে একটা মৎস্য-কেন্দ্রে বড়ো বড়ো পাঁচটা স্টার্জন মাছকে ঠাণ্ডা করা হয়। মাছগুলো ছিল সাড়ে ষোলো ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড তাপের জল-ভরা দুটো পিপেতে। জলের মধ্যে ক্রমেই বেশি বেশি বরফ দিয়ে তার তাপমাত্রা নামানো হয় শূন্য ডিগ্রিতে। নড়চড়া বন্ধ হয়ে যায় মাছেদের, 'আপাত-মৃত্যুর' অবস্থায় পেঁছয় তারা। দু'ঘণ্টা পরে

মাছগুলোকে বার করে রাখা হয় বরফে, প্যাক করা হয় বিশেষ এক ধরনের বাক্সে। তারপর বাক্সগুলোকে তোলা হয় রেফ্রিজারেটর-জাহাজের খোলে। পরের দিন জাহাজ পৌঁছয় আস্ত্রাখানে। খোলা হল বাক্স। আগের মতোই মাছগুলো নিশ্চল, মনে হল মরে গেছে। কিন্তু উষ্ণ (১৭ ডিগ্রি) জলে তাদের রাখতেই তারা চাঙ্গা হয়ে ওঠে!

বলাই বাহুল্য, বিনা জলে জ্যান্ত মাছ পরিবহণ একটা স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে ওঠার আগে আরো পরীক্ষা চালাতে হবে কম নয়। তবে এখনি পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে এ রকম পদ্ধতি পুরোপুরি সম্ভবপর, অদূর ভবিষ্যতে কিশোর জীববিদদের পরীক্ষা ব্যাপকভাবে কাজে লাগবে।

অধিকাংশ সীলমাছ থাকে উত্তরে, ঠান্ডা সাগরে। অনেকক্ষণ ধরে তারা মাছ, বাগদা চিংড়ি, শামুক ইত্যাদি শিকার করার পর জল থেকে উঠে আসে তীরে কিংবা ভাসমান তুষার স্তরের ওপর। কিন্তু জল থেকে সীল উঠে আসে কী করে, যখন শীতকালে সমস্ত সাগর জুড়ে যায় তুষার স্তরে? একটা মত আছে যে এরা তাদের শরীরের তাপ দিয়ে বরফ গলিয়ে কেবল ওপর থেকেই তুষার স্তরে ফুটো করতে পারে। এটা অবশ্যই ঠিক নয়। সামুদ্রিক পশুদের দেহের উপরিস্তরে চর্বির মোটা আচ্ছাদনে ভেতরের তাপ ভালোভাবেই আটকে থাকে, তাই বরফের ওপর দীর্ঘকাল পড়ে থাকলেও তাতে সামান্য একটু তুহিন খালের মতো হয় মাত্র।

চিড়িয়াখানায় আমরা একটা পরীক্ষা চালাই, ফলে এ প্রশ্নের উত্তর মিলেছে। শরৎকালে আমরা সাতটা গ্রীন্‌ল্যান্ডী সীলমাছকে ছাড়ি নতুন এলাকার একটা বড়ো পুকুরে। শীতে তুষারস্তরে পুকুর ঢেকে গেল, শুধু খাবার জায়গাটায় বরাবর ছিল খানিকটা বরফে না-ঢাকা খোলা জল। একবার ভয়ানক ভয় পেয়ে সীলমাছগুলো তাড়াতাড়ি জলের তলে গিয়ে লুকোয়। শিগ্‌গিরই খোলা জায়গাটাও বরফে ছেয়ে গেল, বন্ধ হয়ে গেল তাদের বাইরে বেরিয়ে আসার পথ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটল। অবস্থা বদলাল না। আশঙ্কা হল, জানোয়ারগুলো মারা পড়ল না তো?

সকালে একটা ভাপের ফোয়ারা চোখে পড়ল আমার, পুকুরের তুষারস্তরটার ওপরে উঠে সাবধানে এগিয়ে গেলাম জায়গাটার দিকে। স্বচ্ছ সবজেটে তুষার-

স্তরের মধ্য দিয়ে বেশ দেখা গেল সাতটা সীলমাছের সবকটাই ছোট্ট একটা ফাটলে নাক গুঁজে একসঙ্গে বাতাস টানছে। আর তারা যে নিঃশ্বাস ছাড়ছে, তাতে বুদবুদ উঠছে বরফের তলে, আর জলের দিকটা থেকে বরফ গলে যাচ্ছে। কয়েক ঘণ্টা পরে জায়গাটায় খোলা জল দেখা গেল।

সন্দেহ নেই যে উত্তরেও সীলমাছেরা ঠিক এই করে, কেননা বিভিন্নমুখী বাতাস, জোয়ার আর স্রোতের প্রভাবে মেরু সাগরের বরফে সর্বদা ও সর্বত্রই দেখা দেয় ফাটল। পরে আমাদের পর্যবেক্ষণের সঠিকতা সমর্থন করেন মেরু-অভিযানী ও শিকারবিদরা, উত্তরের প্রাণিসম্পদ নিয়ে যাঁরা সন্ধান চালাচ্ছেন। সরু ফাটলে একদল সামুদ্রিক প্রাণীকে নাক গুঁজে থাকতে দেখলে শিকারীরা বলে:

‘সীলমাছেরা ফুঁ দিয়ে বরফ গলাচ্ছে...’

শীতে চিড়িয়াখানার পুকুরটা ঢেকে যায় বরফের পুরু স্তরে। সীলমাছেরা তখন জল থেকে উঠে আসে কদাচিৎ, বাতাসের তাপমাত্রার চেয়ে বরফের তলেকার জলের তাপমাত্রা তখন অনেক গরম। বসন্তে তারা বেরিয়ে আসে রোদ পোয়াবার জন্যে, ঘুমোয় অনেকখন ধরে, তবে সজাগ ঘুম। বরফ যখন একেবারে গলে যায়, তখন
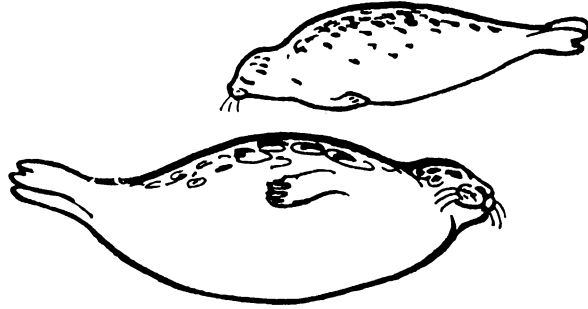
ঘণ্টার পর ঘণ্টা সীলমাছেরা সাঁতরাতে পারে মোটর-লঞ্চের চেয়ে বেশি দ্রুত বেগে। জলাশয়টা তারা চষে বেড়ায় সব দিক থেকে — কখনো জলের তলে, কখনো ওপরে, কখনো চিৎ সাঁতার দিয়ে, কখনো-বা কাত হয়ে। জলে একটা মাছ ছাড়া মাত্র চিড়িয়াখানায় উত্তর-মেরুবাসী এই পোষ্যেরা আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় তাকে তাড়া করে। স্থলে যারা অমন গুরুভার, বেঢপ, তাদের কাছে সেটা আশা করা কঠিন।

শিকার করে আর সাঁতরে ক্লান্ত হয়ে সীলমাছ প্রায়ই পুকুরের তলে ঘুমিয়ে

পড়ে। মিনিট তিন-চার নিথর হয়ে পড়ে থাকে সে, তারপর ওপরে উঠে আসে আধা-ঘুমন্ত অবস্থায়। এখানে সে তার বিপুল ফুসফুস ভরে নিঃশ্বাস নেয়, মুহূর্তের জন্যে চোখ মেলে তারপর ফের তলিয়ে যায় নিচে।

সীলমাছের ঘুম সর্বদাই ছটফটে। তুষারস্তরের ওপরে থাকলে প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর চোখ মেলে তারা। ঘুম ভেঙেই সীলমাছ দ্রুত চোখ বুলিয়ে নেয় চারিদিকে, যেন যাচাই করে নিতে চায়, কোথাও কোনো বিপদ নেই তো? শ্বেত ভল্লুক নেই তো কাছাকাছি? তারপরেই সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ে। মনে হবে বুঝি, নিরাপত্তার এ ব্যবস্থাটা ওরা ভেবে বার করেছে। কিন্তু সামুদ্রিক জীবেরা এটা করে তাদের স্বজ্ঞায়, জন্মগত (অনপেক্ষ) প্রতিবর্ত ক্রিয়ায়, উত্তর মেরুর স্বকীয় জীবন-পরিস্থিতিতে তা গড়ে উঠেছে তাদের পূর্বপুরুষদের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতায়।

সামুদ্রিক সিংহ আর অতোলিৎ

'এ আবার কী ব্যাপার?!' সামুদ্রিক সিংহের শবব্যবচ্ছেদ করে অবাক হলেন চিড়িয়াখানার ডাক্তার। 'পাকস্থলী আর নাড়িতে এর এত ক্ষত কেন? খাদ্য থেকে? কিন্তু গ্রীন্‌ল্যাণ্ডী সীলমাছগুলোও তো এই একই নাভাগা মাছ খায়, অথচ দিব্যি আছে ওদের পাকস্থলী।'

চিড়িয়াখানা যত সামুদ্রিক সিংহ (দীর্ঘকর্ণ সীলমাছ) পেয়েছে, থেকে থেকেই কেন রোগে পড়েছে তারা?

এই রহস্য উদ্ধারের চেষ্টা চালালাম আমরা, এবং শিগ্‌গিরই লক্ষ্য করলাম যে সামুদ্রিক সিংহের পরিপাকপথটায় 'অতোলিৎ', বা নাভাগা মাছের কানের ছোটো ছোটো হাড় ছড়ানো।

আর নাভাগা মাছ এরা খেত বিপুল পরিমাণে।

অতোলিতের ধারগুলো ভয়ানক খাঁজ-কাটা, উখোর মতো। সামুদ্রিক সিংহের পাচক রসে সে হাড় গলে না, পাকস্থলী আর নাড়িতে আটকিয়ে গিয়ে তাদের গা আঁচড়ে দেয়। আঁচড়ের জায়গাগুলোয় দেখা দেয় ক্ষত।
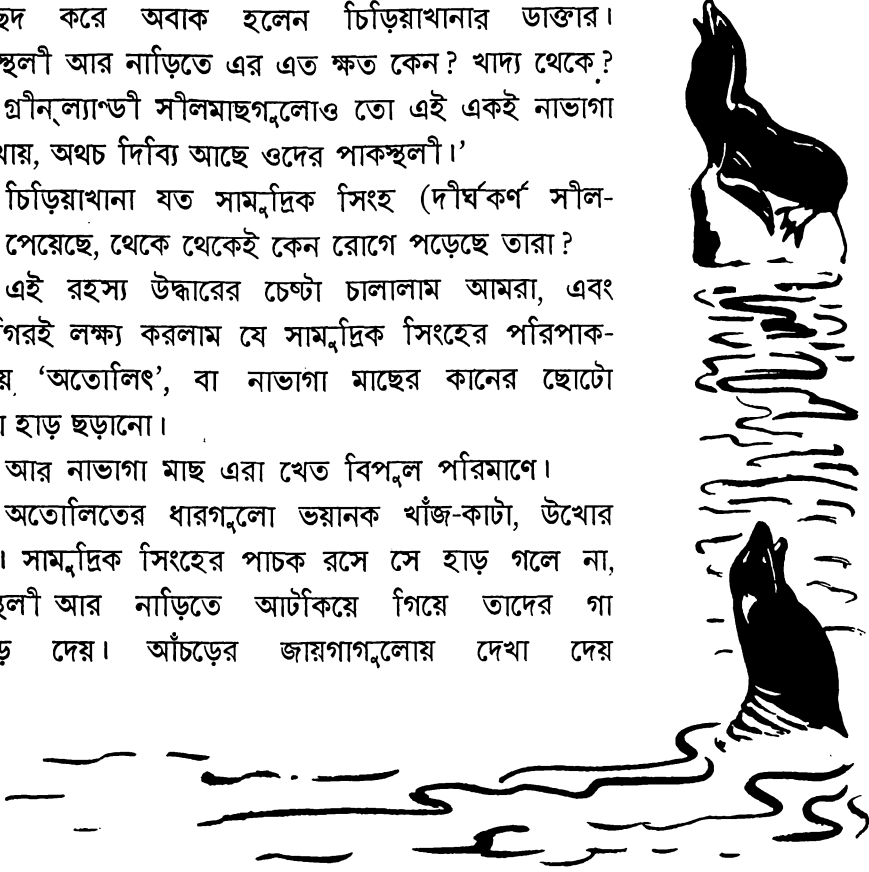
চিড়িয়াখানায় প্রতিটি সামুদ্রিক সিংহ পেত দিনে ষোলো কিলোগ্রাম করে নাভাগা মাছ। তার মানে, একদিনেই তার পেটে জমত অন্তত দু'-তিন মুঠো করে অতোলিৎ। বোঝাই যায়, ছোটো ছোটো এই করাতগুলো কী জখম করেছে ঐ হতভাগ্য জীবগুলোকে!

কিন্তু অতোলিতে গ্রীন্‌ল্যাণ্ডী সীলমাছের স্বাস্থ্যহানি হল না কেন, যদিও সামুদ্রিক সিংহের চেয়ে নাভাগা মাছ তারা পেত খানিকটা কম? খুব সম্ভব এইজন্যে

যে গ্রীন্‌ল্যান্ডী সীলমাছ যেসব জলে থাকে, নাভাগাও থাকে সেখানে। ক্রমাগত তা খাওয়ায় তারা ও খাদ্যটার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছে: নাভাগা খাওয়ার আগে তারা কামড়ে ফেলে দেয় তার মাথাটা। তাই অতোলিৎ-ও তাদের পেটে যায় না।

সামুদ্রিক সিংহের এ অভ্যাস গড়ে ওঠে নি, কেননা তাদের জন্মস্থান দক্ষিণ আমেরিকা, সেখানে তারা খেত অন্য খাদ্য।

সামুদ্রিক সিংহদের মৃত্যুর কারণ জানার পর বাকি যারা টিকে ছিল, তাদের দেওয়া হত মুড়ো-ছাড়া নাভাগা মাছ।
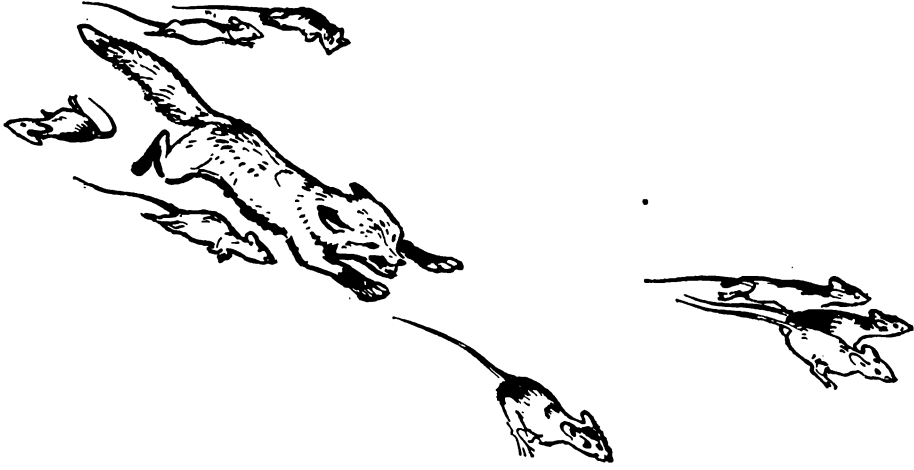
ধেড়ে ইঁদুরের সঙ্গে যুদ্ধ

একসময় মস্কোর ঘর-বাড়ি, তল-কুঠরি আর গুদামে গিজগিজ করত ধেড়ে ইঁদুর। চিড়িয়াখানারও সর্বত্র সেঁধিয়েছিল ওরা। ইঁদুর ছিল প্রতিটি খোঁয়াড়ে, প্রতিটি খোলা চত্বরে, প্রতিটি বাসা-বাড়ি আর আপিসে। জানোয়ারদের খাদ্য চুরি করত তারা, নড়বড়ে করে দিত দেয়াল-খুঁটি, প্রাণনাশ ঘটাত প্রাণীদের। জলাশয়ের ধারে ওঁৎ পেতে থাকত তারা ছোটো ছোটো জলচর পাখি ধরার জন্যে। পুকুর আর অ্যাকোয়ারিয়মে টুক করে ডুব দিয়ে মাছ মারত। এদের সঙ্গে লড়ার কিছু একটা উপায় ভেবে বার করা দরকার। কেননা বিষ বা ইনজেকশন চিড়িয়াখানায় অচল, তাতে ইঁদুরের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য জন্তুও মারা পড়তে পারে বিষে। কল পেতে ধরার চেষ্টা করলাম আমরা, ছোটো ক্যালিবারের বন্দুক দিয়ে গুলি

চালালাম। কিন্তু তাতে যা ধ্বংস হল তাদের জায়গা নিল আশেপাশের পাড়া থেকে আসা নতুন অক্ষৌহিণী।

চিড়িয়াখানার জীবনে নিজেদের বেশ খাপ খাইয়ে নিয়েছিল ইঁদুরেরা। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড যেসব পাখি কেবল পচা মাংস খেয়ে থাকে, তাদের ডেরায় অসঙ্কোচে মাতব্বরি করে বেড়াত তারা। তবে তিতির-বাজদের খাঁচায় ঢুঁ মারার ঝুঁকি নিত কদাচিৎ, এদের 'খাদ্য-তালিকায়' এই চটপটে তীক্ষ্ণদন্তীরাই ছিল সবচেয়ে উপাদেয় ডিশ। রাত্রে পেঁচাদের কাছে কদাচ না গেলেও ইঁদুরেরা তাদের খাবার মারত দিনের বেলায়। এ রকম হামলায় তাদের দুশ্চিন্তার কিছু ছিল না, কেননা দিনের বেলায় পেঁচা নিশ্চল হয়ে বসে থাকে। এই শিকারী পাখিরা সাধারণত শিকার ধরতে শুরু করে অন্ধকার নামলে।

ফেজণ্ট আর ময়ূরদের চত্বরে ইঁদুরদের উৎপাত ছিল খুবই বেপরোয়া। রাত্রে তারা এসে হামলা করত আর আইনসঙ্গত ঘরের মালিকদের রাত কাটাতে হত গাছের ডালে। এমনকি বেড়ালেরাও মাঝে মাঝে হটে যেত এই ইঁদুর অক্ষৌহিণীর ঔদ্ধত্যের সামনে।

এই ঘোর শত্রুর সঙ্গে লড়াইয়ে আমরা ফেজণ্টদের অন্য জায়গায় সরিয়ে সেখানে ঈগল-পেঁচাদের বসাই কয়েকবার। তখন সকালে তন্দ্রালু পেঁচাদের নখে দেখা যেত আধ-খাওয়া ইঁদুর। কিন্তু সেইটেই সব নয়। মাটিতে চিহ্ন দেখে বোঝা যেত রাতে এখানে তুমুল সংঘর্ষ হয়ে গেছে। যারা ডিউটিতে থাকত সত্যিকারের যুদ্ধ দেখেছে তারা। পেঁচার হাতে ধরা পড়া ইঁদুরের ডাকে উত্তেজিত হয়ে তাকে প্রায়ই আক্রমণ করত আরো কয়েক ডজন ক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণদন্তী। প্রকাণ্ড এই নৈশ পাখিটা সে আক্রমণ ঠেকাত, ধারালো নখে চেপে ধরত তার শত্রুদের, পিষে টুকরো টুকরো করে ফেলত। তাহলেও ইঁদুরদের হামলায় এমন ভয়ঙ্কর শিকারী পাখিকেও তার শিকারটি নিয়ে আশ্রয় নিতে হয়েছে গাছে। আর তার চেয়ে কমজোরী অন্য জাতের ছেয়ে রঙের পেঁচাদের আমরা সকালে কখনো কখনো দেখেছি ইঁদুরের আক্রমণে ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে আছে।

তবে যতই দাপট করুক, ঈগল-পেঁচার সঙ্গে দু'দিন লড়াইয়ের পর ইঁদুরেরা বহুদিন এখানে আর টিকি দেখাত না।

স্তেপের কোরসাক জাতের অনতিবৃহৎ ক্ষিপ্র শেয়ালটাও ইঁদুরদের জব্দ করে সমান সাফল্যে। শত্রু সংহারের জন্যে তাকে যে জায়গাটা 'দেওয়া হয়', সকালে তা

দেখা যেত শবদেহে আকীর্ণ: এখানে ওখানে পড়ে থাকত প্রচুর পরিমাণ ইঁদুর, মাথার খুলি তাদের টুকরো টুকরো, আর কিছুই যেন হয় নি, এমনি ভাব করে গুটিসুটি মেরে কোরসাক নিশ্চিন্তে নিদ্রা দিত কোণটিতে।

১৯৩৫ সালের বসন্তে মস্কোয় আসেন লণ্ডন জু-এর ডিরেক্টর উইওয়েৰ্স। আমাদের চিড়িয়াখানায় এসে তিনি জানান যে তাঁদের পশুদ্যানে ইঁদুরের সঙ্গে সফল লাড়াই চালানো হয় একটি উদ্ভিদের একস্ট্র্যাক্ট দিয়ে। উদ্ভিদটি হল সামুদ্রিক পেঁয়াজ (Scilla maritima), বন্য অবস্থায় তা পাওয়া যায় ভূমধ্যসাগর ও আটলাণ্টিক মহাসাগরের কূলে। ওটা আমাদের 'প্রলেসকা'র স্বগোত্র, তার খুবই কাছাকাছি জাতের উদ্ভিদ পাওয়া যায় কৃষ্ণ সাগর তীরে, সুখুমি এলাকায়।

লণ্ডনে ফিরে ডক্টর উইওয়েৰ্স পরীক্ষার জন্যে আমাদের এক বোতল একস্ট্র্যাক্ট পাঠান। লেবেলে লেখা ছিল, বিষটা কেবল তীক্ষ্নদন্তীদের ওপর কাজ করে, অন্য জন্তুদের পক্ষে তা একেবারে নিরাপদ। তাহলেও বিজ্ঞাপনকে বিশ্বাস করতে ভরসা হল না। ঠিক হল আগে কয়েকটা পরীক্ষা করে দেখা যাক। বিশেষভাবে ধরা ইঁদুর, বেড়াল আর চড়ুইদের দেওয়া হল বিষ-মেশানো খাবার। একদিন বাদে ইঁদুরের খাঁচায় দেখা গেল ইঁদুরের দেহের পশ্চাদ্ভাগ অসাড় হয়ে গেছে, কিন্তু বেড়াল আর চড়ুই দিব্যি আছে আগের মতোই।

বিজ্ঞাপন তাহলে মিছে কথা বলে নি। পরীক্ষা শেষ করার পর আমরা ইঁদুরগুলোকে নির্দিষ্ট সময়ে খাবার খেতে আসতে অভ্যস্ত করাই — খাবার দেওয়া হত দুধে ভেজানো শাদা রুটি। তারপর একস্ট্র্যাক্ট মেশানো দুধে দু'কিলোগ্রাম শাদা রুটি ভিজিয়ে চিড়িয়াখানার ওইসব জায়গাগুলোয় তা রেখে দিয়ে ফলাফলের অপেক্ষায় রইলাম। পরের দিনই ইঁদুর অদৃশ্য হল। শুধু কখনো-সখনো দু'-একটা চোখে পড়ত রাস্তায়, শরীরের পেছনের দিকটা তাদের অবশ।

জলচর পাখিদের খাবার জায়গায় বরাবরই কয়েক শ' করে ইঁদুর দেখা যেত। এবার কিন্তু পাখিদের জন্যে দেওয়া খাবারের কাছে আসে কেবল চারটি ইঁদুর-ছানা।

চিড়িয়াখানার এলাকায় সর্বদাই আশ্রয় নিত বহু বেড়াল। মূষিক অক্ষৌহিণীকে তারা খানিকটা ভয়

পেলেও মোটেই উপোস দিত না। চিড়িয়াখানায় বিষ ছড়াবার পর বেড়ালেরা পড়ল মুশকিলে: ইঁদুর না থাকায় তারা জলচর পাখি শিকার করতে শুরু করল। অগত্যা গুলি করে মারতে হল বেড়ালদের।

ব্যাপারটা এতেই চুকল না: ইঁদুরের ফাঁকা গর্তগুলো থেকে রাস্তায় বেরিয়ে আসতে লাগল পিসু কীট, দর্শকরা চুলকিয়ে মরত।

তবে মস্কো ইঁদুর বিদুরণ সম্ভব হয় কেবল তখন, যখন শুধু চিড়িয়াখানায় নয়, মস্কোর সমস্ত মহল্লাতেই সংগঠিত সংগ্রাম চলে তাদের বিরুদ্ধে। এখন রাজধানীতে ইঁদুর দেখা যায় কালে-ভদ্রে। আমাদের দক্ষিণ অঞ্চলে চাষ হচ্ছে সামুদ্রিক পেঁয়াজের, কেননা ওষুধ হিশেবেও তা প্রযুক্ত হচ্ছে।

কানা পাইক মাছ

কয়েকটা পাইক মাছ থাকে মস্কো চিড়িয়াখানার বড়ো-সড়ো, প্রচুর আলোকিত একটা অ্যাকোয়ারিয়মে। সবকটা মাছেরই রঙ উজ্জ্বল হলদেটে, শুধু একটা একেবারে কালো। যারা মাছের ব্যাপারী, চিড়িয়াখানায় তারা এলে অ্যাকোয়ারিয়মের কাছে অনেকখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কালো মাছটাকে লক্ষ্য করে। প্রায়ই মন্তব্য শোনা যায়:

‘অবাক কাণ্ড! বাইরে থেকে পাইক যেমন হয় তেমনি, অথচ রঙটা তেমন নয়। নিশ্চয় অন্য জাতের...’

না, ওই একই জাতেরই! ব্যাপারটা হল, মাছের রঙ নির্ভর করে আলোর ওপর। আলো যত জোরালো হবে, মাছের চামড়ার রঙও হবে তত ফিকে। সেটা হয়, কারণ আলোর প্রতিক্রিয়ায় চামড়ার রঞ্জক-কণাগুলো ছোটো ছোটো ডোরায় এসে জমে, ফলে সাধারণভাবে গা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। সেইজন্যেই উজ্জ্বল আলোর অ্যাকোয়ারিয়মে রাখা পাইক মাছগুলো অমন হলদেটে।

কিন্তু কালো পাইকটাও তো ওই একই অ্যাকোয়ারিয়মের একই জলে পাশাপাশিই থাকে। পরিস্থিতিটা পুরোপুরি এক, অথচ চামড়ার রঙ একেবারেই অন্য রকম।

তফাৎটা হল কেন?

যদি মন দিয়ে নজর করা যায়, তাহলে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে কালো পাইকটা কানা। দু’চোখেই তার শাদা ঢেলা। অনুসন্ধানে দেখা গেল, আলো রঞ্জক-কণাকে প্রভাবিত করে সোজাসুজি চামড়া ভেদ করে নয়, চোখের মধ্য দিয়ে গিয়ে, এবং সোজাসুজি রঞ্জক-কণার ওপর নয়, মস্তিষ্ক মারফত। চোখের মণিতে জ্বলজ্বলে

আলো পড়লে স্নায়ুর প্রান্তগুলো উত্তেজিত হয়ে ওঠে; স্নায়ু বেয়ে সে উত্তেজনা পেঁছয় মস্তিষ্কে, সেখান থেকে চামড়ায়, যার ফলে তার রঞ্জক-বিন্যাস বদলিয়ে যায়। মাছের যদি চোখ বেঁধে রাখা হয়, তাহলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই তার রঙ খানিকটা কালচে হয়ে উঠবে, এমনকি আলো যদি খুব জোরালো থাকে তাহলেও। পাইকের চোখে যদি লাল কাঁচের আঁটো করে বসা চশমা পরানো হয়, তাহলেও এই ঘটবে।

কালো পাইকটা চমৎকার হৃষ্ট-পুষ্ট, নিজের অন্ধত্বে তার যেন কোনোই অসুবিধা হয় না। কাছ দিয়ে কোনো ছোটো মাছ সাঁতরে গেলে সে তাকে গিলে ফেলে চক্ষুষ্মান্ পাইকগুলোর চেয়ে খারাপ নয়, কেননা শিকার যে কাছিয়ে আসছে সেটা সে টের পায় জলের কম্পনে, কিংবা হয়ত মাছের ডাক শুনে। মাছেরা যে ডাকে, তা এখন প্রমাণিত।

যারা মাছ ধরে তারা সবাই নিশ্চয় দেখেছে, খুব গভীরে যেখানে আলো পেঁছয় কম, সেখান থেকে ছিপে টেনে তোলা গাঢ় রঙের মাছ ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে কত তাড়াতাড়ি। রৌদ্রময় অগভীর জলে ঐ একই মাছ রঙে উজ্জ্বল বালি বা নুড়ির সঙ্গে মিলে যায়।

পরিবেশের পটের সঙ্গে মিশে যাওয়া গায়ের রঙকে বলা হয় পৃষ্ঠপোষিত বা সামঞ্জস্যবিধায়ক রঙ। হিংস্র মাছের আক্রমণ থেকে তা বহু মাছকে বাঁচায়, আবার অগভীর জলে অলক্ষ্যে শিকারের দিকে এগিয়ে যাবার ক্ষেত্রে হিংস্র মাছকেও সাহায্য করে তা। পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার ব্যাপারে প্রাণীদের স্নায়ু-ব্যবস্থার ভূমিকা কী, তা এ দৃষ্টান্ত থেকে ভালো বোঝা যাবে।
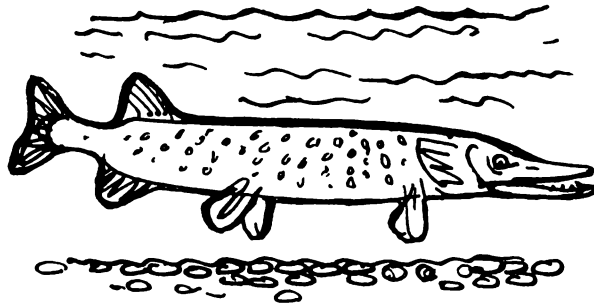
শাদা খরগোস

বসন্তে খরগোসেরা তাদের 'ওভারকোট খোলে', অর্থাৎ শীতে গজানো ঘন লম্বা লোম তার দলায় দলায় খসে পড়ে, তার জায়গায় দেখা দেয় গ্রীষ্মকালীন বাহারে পোষাক, অর্থাৎ লোম গজায় ছোটো ছোটো আর পাতলা। খরগোসদের লোম বদলায় মার্চ, এপ্রিল, এমনকি মে মাসেও; কী রকম জল-বায়ুর পরিস্থিতিতে তাদের বাস, তার ওপর সেটা নির্ভর করে।

সারা গ্রীষ্ম শাদা খরগোসের গা ঢাকা থাকে লালচে-খয়েরী রঙের অপেক্ষাকৃত পাতলা লোমে। কিন্তু শরৎ এলে মনে হবে যেন লোম না বদলিয়েই তা ফের শাদা ও ঘন-লোমশ হয়ে ওঠে।

গ্রীষ্মোপযোগী ছোটো ছোটো পাতলা লোমের স্থলে এই শীতের লোমের বদলিটা হয় বেশ দ্রুত — সাধারণত দু'তিন সপ্তাহের মধ্যে। মাঝে মাঝে খরগোসের মাথার সবটা শাদা হয় না, এমনকি শীতকালেও থাকে ছোপ-ছোপ। প্রায়ই শীতে শাদা খরগোসের কান, নাক, গাল আর চোখের ওপরটাতেই বাদামী-ধূসর দাগ থেকে যায়। যেসব খরগোসের গরমের লোম বদলিয়ে শীতের লোম গজায় বড়ো বেশি দেরি ক'রে, একেবারে ঠান্ডা পড়ার মুখে, রাত বড়ো হতে শুরু করার সময়, তাদের বেলাতেই এটা হয়।

হেমন্তের ছোটো দিনগুলোতেই শুরু হয় রঙ বদলানো আর শাদা লোম বাড়ার প্রক্রিয়া।

চিড়িয়াখানায় হেমন্তে খরগোসের রঙ বদলানো পর্যবেক্ষণ করে আমরা প্রশ্ন রাখি: কিন্তু গ্রীষ্মের লোমগুলোর দশা কী হল?

তা খসে পড়তে দেখা যায় কম।

তার জবাব আমরা পাই একটা পরীক্ষা চালিয়ে। জুলাইয়ের শেষে তিনটে শাদা খরগোসকে বাসমা'র রঙ, মেহেদীর রঙ আর হাইড্রোজেন পেরোক্সাইড মাখাই।

রঙ দাঁড়াল তাদের জ্বলজ্বলে বাদামী চেহারা, একেবারে হেমন্ত পর্যন্ত তারা এই অস্বাভাবিক রঙ নিয়ে গরব করে বেড়াল। কিন্তু নভেম্বরের মাঝামাঝি আসতেই

‘বাদামীরা’ হয়ে গেল একেবারে শাদা, শুধু কানের ডগাটি রয়ে গেল কালো। নতুন নতুন বহু লম্বা লম্বা শাদা লোম গজিয়ে গ্রীষ্মে রাঙানো লোমগুলোকে পুরোপুরি ঢেকে ফেললে।

গুণে দেখা গেল, গরমকালে রাঙানো প্রতিটি লোম পেছু গজিয়েছে ৮—১০টি করে শীতকালের লোম।

আরো দেখা গেল, কোনো কোনো শাদা লোমের ওপরটা রয়ে গেছে বাদামী। তার মানে, খরগোসের শীতের লোম গজাতে থাকে জুলাই থেকেই, যদিও প্রবলভাবে তা বাড়ে কেবল হেমন্তেই।

হেমন্তে শাদা লোম দ্রুত বেড়ে উঠে গ্রীষ্মের কালচে লোম ঢেকে ফেলে।

চুল আমরা গুণি খরগোসের পিঠ থেকে ছোটো এক টুকরো চামড়া চেঁছে নিয়ে। সেটা কাটার সময় খরগোসটার কোনোই ভাবান্তর হল না, যেন টেরই পায় নি যে তার গা থেকে ‘জীবন্ত ছাল ছাড়িয়ে নেওয়া হচ্ছে’। সত্যিই, শাদা খরগোসদের খুব একটা বৈশিষ্ট্য আছে, তাদের চামড়ার ওপরের স্তর (এপিতেলি) অনেকখানি চেঁছে নিলেও বড়ো একটা রক্ত বেরয় না।

ধরে নিতে হয় যে বিশেষ যন্ত্রণাও বোধ করে না সে।

একবার শিকারে জখম একটা খরগোসকে মাটি থেকে তোলা হয় তার লোম মুঠো করে চেপে।
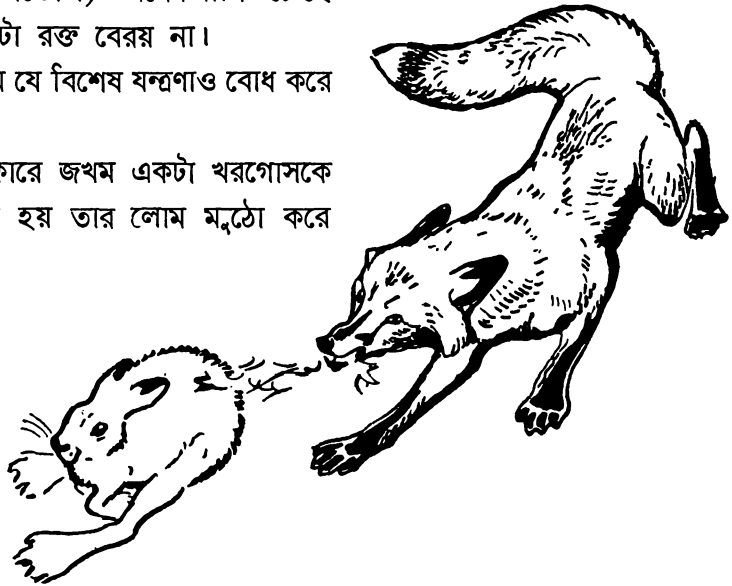
বিঘৎ পরিমাণ চামড়ার একটা পাতলা স্তর রয়ে গেল হাতে, কিন্তু চামড়ার অনাবৃত পুরু অংশটার কোথাও বিন্দুমাত্র রক্ত দেখা গেল না।

আরেকবার শীতে আমরা এক খরগোসের সন্ধান পাই, শেয়াল তাড়া করেছিল তার পেছনে।

শেয়ালটা খুব চেপে ধরেছিল খরগোসকে, থেকে থেকেই কোনাচি মেরে তার পথ আটকাচ্ছিল। দু'জায়গায় সে একেবারে এসে পড়েছিল তার শিকারের কাছাকাছি, তাহলেও দ্রুতগামী খরগোসটাকে সে ধরতে পারে নি: পাশ দিয়ে লাফিয়ে গিয়ে সে তার চামড়া কামড়ে ধরে... কিন্তু দাঁতে কেবল খরগোসের একটুকরো চামড়া নিয়েই তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

খরগোস ততক্ষণে অনেক এগিয়ে গেছে।

দু'বার দেখা গেছে, শেয়ালের পায়ের চিহ্নের কাছে লুটচ্ছে উগড়ে-ফেলা খরগোসের লোম আর চামড়া, কিন্তু বরফের ওপর এক ফোঁটা রক্তকেও টকটক করতে দেখা যায় নি। খরগোস ধরা পড়ে নি।

শাদা খরগোসরা বেঁচে যায় তাদের চামড়ার আলগা উপরি-স্তরের দৌলতে, যেমন কিছু কিছু টিকটিকি বাঁচে তাদের সহজে খসে-আসা লেজ দিয়ে।

একই রকম ব্যাপার দেখা যায় হ্যাজেল-গ্রাউজদের বেলায়। প্রচণ্ড ভয় পেলেই তার পালক ঝরে যায় খুব সহজে, অথচ বনে বেশ জোরে উড়ে গেলেও তা খসে না।

শিকারীর গুলি খেলেও তাই হয়: মৃত্যু খিঁচুনিতে ছটফট করে পাখিটা, আর তার চারিপাশে গড়ে ওঠে ঝরে পড়া পালকের বেষ্টনী। দ্রুত ঘনিয়ে আসা বিপদের মুখে হ্যাজেল-গ্রাউজ যত তাড়াতাড়ি পালক ছড়ায় তাতে বাজ বা অন্য কোনো শিকারী পাখির ছোঁ থেকে সে মাঝে মাঝে বেঁচে যায়, উড়ন্ত পাখিটার নরম পালকের মেঘে লক্ষ্যচ্যুত হয় তারা। তাই, এই বৈশিষ্ট্যটাকে ধরা উচিত আত্মরক্ষা প্রতিযোজন ব'লে।

ঈগলের শিকার

সূর্য ঢলেছে অস্তাচলে। স্তেপে এক হপ্তা কাজের পর আমি সেমিপালাতিনস্কে ফিরছি একমাত্র মেঠো পথটা দিয়ে। অন্ধকার নেমে আসছে, অথচ শহর এখনো দূরে। হঠাৎ পাহাড়তলির পেছনে দেখা গেল কাজাখদের একটা ছাউনি। দরজার মুখে দাঁড়িয়েছিল গৃহস্বামী, আমায় দেখে অমায়িকভাবে সে হাসলে। নমস্কার বিনিময় করলাম আমরা। জিরিয়ে নেবার জন্যে সে আমন্ত্রণ জানাল আমায়। ছাউনির কোণে একটা খোঁটায় বসে ছিল বিশাল এক বেরকুট ঈগল। তার নিশ্চলতা বিভ্রান্তিকর; মনে হতে পারত বুঝি ওটা স্টাফ-করা পাখি।

'অন্ধকারে ও বসে আছে যে?' জিজ্ঞেস করলাম গৃহস্বামীকে। 'এতে যে ওড়াই ভুলে যাবে।'

পাখির মালিক মুচকে হাসল। পাখিটাকে বাইরে এনে সে তার মাথা থেকে টুপি খুলে ছেড়ে দিল। প্রকাণ্ড শিকারী পাখিটা তার বিশাল ডানা নেড়ে পাক

দিতে লাগল ছাউনির ওপরে। ক্রমে ক্রমে খুব উঁচুতে উঠে গেল ঈগলটা, মনে হল আর ফিরবে না। কিন্তু তার মালিক জোরে হাঁক দিতেই ঈগল ডানা গুটিয়ে পাথরের মতো পড়তে লাগল আমাদের পায়ের দিকে। একেবারে মাটির কাছাকাছি এসেই সে তার ডানা মেলে হালকাভাবে মাটি ছুঁল। আগের জায়গায় তাকে নিয়ে গিয়ে পুরস্কার হিশেবে দেওয়া হল বড়ো একখণ্ড মাংস।

পালকওয়ালা বন্ধুর গায়ে আদর করে হাত বুলিয়ে গৃহস্বামী বললে, 'খাশা শিকারী। তুষার পাত শুরু হচ্ছে। যদি চাও তো কাল প্রথম তুষার পাতে চলো, একসঙ্গে যাই শিকারে।'

আমি রাজী হলাম। সকালে রওনা দিলাম ঘোড়ায় চেপে। কাজাখটির হাত ছিল একটা বিশেষ ঠেকার ওপর, চামড়ার দস্তানায় ঢাকা। ঈগলটা তার ওপর বসে ছিল নিশ্চল হয়ে। একটা নীরন্ধ্র টুপিতে তার মাথাটা পুরো আঁটা।

শিগ্‌গিরই নেকড়ের পায়ের চিহ্ন চোখে পড়ল, আর গোটা দশ কিলোমিটার পরে দিগন্তে দেখা গেল নেকড়েকেই। ঈগলের মাথা থেকে টুপি খুলে নিল শিকারী, বিরাট পাখিটা উড়ে গেল আকাশে।

কয়েকবার পাক দিয়ে ঈগলের নজরে পড়ল তার শিকার, একেবারে হিশেব করে সে পেছু নিলে। উড়তে লাগল শোঁ শোঁ করে, ঈগল আর নেকড়ের মধ্যে ব্যবধান দ্রুত কমতে লাগল। প্রাণপণে ঘোড়া ছোটালাম আমরা। কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই নেকড়ে আর তার ডানাওয়ালা পশ্চাদ্ধাবক হারিয়ে গেল পাহাড়তলির আড়ালে।

অকুস্থলে যখন পৌঁছলাম, তখন পাখি আর জানোয়ারের দ্বন্দ্বযুদ্ধে শিকারীর হস্তক্ষেপ প্রায় অনাবশ্যক। এক পায়ে ঈগল পাখিটা তার শিকারের উরুতে নখ বিঁধিয়ে অন্য পায়ে উল্টে ফেলা নেকড়ের মুখটা চেপে ধরেছে। পাখি তাকে এত জোরে ঠেসে ধরেছে যে সিধে হতে দিচ্ছিল না। কাঁচা চামড়ার বেল্টে পাখির পা বেশ শক্ত করে গাঁথা। এই সাবধানতাটুকু অনাবশ্যক নয়: নইলে জোরদার নেকড়ে সিধে হবার চেষ্টায় ঝাঁকুনি দিতে গিয়ে ঈগলের ঠ্যাঙ ভেঙে ফেলতে পারত।

লড়াই শেষ হয়ে আসছিল। শিকারী ঈগলের কাছে গিয়ে চট করে তার

আলখাল্লা ছুড়ে দিলে তার ওপর, আর আলখাল্লার তলে খপ করে টুপি পরিয়ে দিল তার মাথায়। সঙ্গে সঙ্গেই নরম আর শান্ত হয়ে এল পাখিটা।

বলাই বাহুল্য, নেকড়েকে ঘায়েল করা ঈগলের পক্ষে সহজ নয়। সেইজন্যেই শিকারী আরো বেশি ভালোবাসে আর কদর করে তার দুঃসাহসী পাখিটাকে, যা শরতে তার জন্যে শিকার করে দেয় বহু খরগোস, শেয়াল এবং আরো নানা ফারওয়ালা জন্তু।
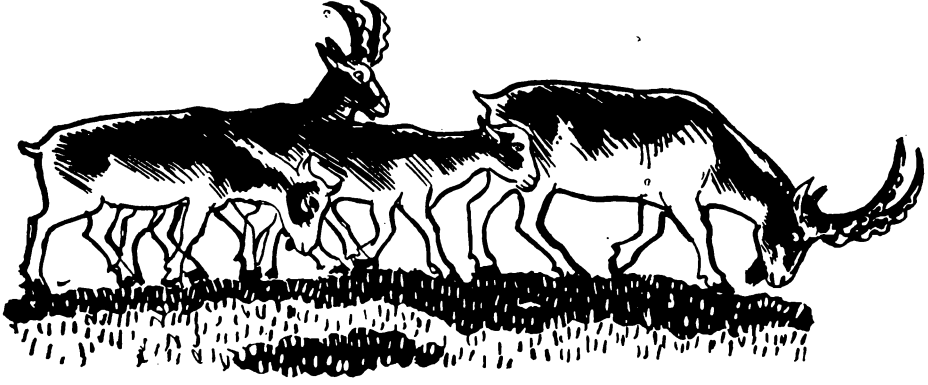
হিংস্র জন্তুদের শিকার

গুপ্ত আশ্রয় থেকে খরগোস লাফিয়ে বেরলে শেয়াল তার পেছু ধাওয়া করল শতখানেক মিটার। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তার পাল্লা ধরতে না পারলে সে খরগোসকে ছেড়ে দিয়ে ইঁদুর শিকার চালিয়ে যায়। সাধারণত অনিশ্চিত শিকারের পেছু নিয়ে অযথা শক্তিক্ষয় করে না হিংস্র জন্তুরা। একবার লাফ দিয়ে ফসকে গেলে বনবিড়ালও আর খরগোসের পেছু নেয় না।

অথচ লোকের ধারণা হিংস্র জন্তুর হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় কেবল দৌড়ে ছুটে। এটা সত্যি নয়, যদিও ক্ষিপ্রতারও যথেষ্ট গুরুত্ব আছে।

ইউক্রেনের স্তেপে একবার দেখেছিলাম, খরগোসরা খাচ্ছে, আর একটা শেয়াল তাদের ঘিরে পাক দিতে দিতে ক্রমাগত কাছিয়ে আসছে, কিন্তু পাক-খাওয়া মূর্তিটায় ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে গিয়ে সেদিকে ভ্রূক্ষেপই করছে না খরগোসগুলো।

মস্কোর ফার ইনস্টিটিউটের জীব-টেকনোলজি বিভাগের স্নাতকোত্তর গবেষক ম. প. পাভলভ ক্রিমিয়ার প্রাণীদের জৈবিক বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করছিলেন। একবার তিনি পাহাড়ের গাছপালাভরা ঢালু দিয়ে যাচ্ছিলেন। তৃণক্ষেত্রে তাঁর চোখে পড়ল একটা শেয়াল, তার কিছু দূরে নিশ্চিন্তে ঘাস খাচ্ছে একটা খরগোস। গাছের সঙ্গে সেঁটে থেকে তিনি লক্ষ্য করলেন যে শেয়ালটা যেন খরগোসকে দেখে নি এমনি

ভাব করে যখন তার কাছ দিয়ে যাচ্ছিল, তখন খরগোসটা মাত্র খানিকটা ছুটে গিয়ে ফের তার খাওয়া চালাচ্ছিল।

এইভাবেই চলল অনেকখন।

শেষে বাতাসে পাভলভের ওভারকোটের ঝুলের দিকটা দুলে উঠল। সেটা খরগোসের চোখে পড়তেই এক লাফে সে লুকিয়ে গেল ঢালুর আড়ালে। শেয়াল সেটা লক্ষ্য করে নি, তখন সে তাকিয়ে ছিল উল্টো দিকে। তারপর যখন সে খরগোসকে আর স্বস্থানে দেখল না, তখন চঞ্চল হয়ে উঠল শেয়ালটা, গন্ধ শুঁকতে লাগল তার চিহ্নের, তারপর লাফাতে লাফাতে তার পেছু নিল।

ম. প. পাভলভ যদি খরগোসটাকে ভয় না পাওয়াতেন, তাহলে ৫—১০ মিনিটের মধ্যেই সে পড়ত শেয়ালের কামড়ে, খরগোসের পক্ষে আচমকা কয়েকটা লাফেই শেয়াল ঘায়েল করত তাকে।

একবার কালিনিন অঞ্চলে সঙ্গিনী ডাকার ডাক দিচ্ছিল একটা তিতির। চোখে পড়ল যে খানা বেয়ে তার দিকে এগুচ্ছে একটা শেয়াল। তিতিরটা তা লক্ষ্য করে খানিকটা ছুটে গেল, কিন্তু তার বাসন্তী ডাক থামাল না। শেয়াল তখন উঠে এসে, তিতিরের চোখের সামনে খানিক গড়াগড়ি করে চলে গেল মাঠে; তারপর তিতিরের দিকে মুখ না ফিরিয়েই আস্তে আস্তে কাছিয়ে আসতে লাগল। তিতির তার ডাক চালিয়ে যায়, তবে প্রয়োজনীয় দূরত্বটা বজায় রাখে পিছিয়ে গিয়ে।

শেয়াল থেমে গেল তখন, মহড়া নেওয়া ছেড়ে দিয়ে ডোবা থেকে খানিক জল খেয়ে চলে গেল আরেক দিকে, অন্য একটা তিতিরের শব্দ আসছিল সেখান থেকে।

পিতৃভূমির যুদ্ধে নিহত জীববিদ আন্দ্রেই পনোমারিয়োভের কাছ থেকে শুনেছি, ভূতপূর্ব ল্যাপ্ল্যান্ড সংরক্ষিত জীবাঞ্চলে চুনা নদীর বরফের ওপর উঠে দেখেন এক জায়গায় বরফে ঢাকা না পড়া খানিকটা খোলা জল রয়েছে, তার কাছেই ডাঙায় গ্লাটনজাতীয় নেউল আর শেয়ালের পায়ের দাগ।

চিহ্ন দেখে বোঝা গেল দুটো জন্তুই জায়গাটার দিকে এগোয় বিভিন্ন দিক থেকে এবং ক্রমশ পরস্পর কাছিয়ে আসে। শেষ পর্যন্ত গ্লাটন সুযোগ পাওয়া মাত্র শেয়ালের মাথা কামড়ে তার টুঁটি চিপে মারে। তার পায়ের চিহ্নের এক ধার দিয়ে ছেঁচড়ে গিয়েছিল তার শিকার, স্কী করে জন্তুটার পেছু ধরতে লেগেছিল অনেকখন। শেষ পর্যন্ত তিনি দেখতে পান বরফের ওপর রক্তাক্ত শেয়ালটাকে। বড়ো আকারের মর্দা সেটা।

ককেশাসের সংরক্ষিত জীবাঞ্চলে অনেকবার দেখা গেছে যে কোনো কোনো নেকড়ে পাহাড়ে ছাগলদের পালের কাছাকাছি থাকে, তাদের মেরে খায়। জন্তুটাকে প্রায় দেখতে পায় ছাগলরা, এমনকি তাদের চোখের সামনেই তা ঘুমোয়। এতে অভ্যস্ত হয়ে যায় তারা।

ছাগল দেখা মাত্রই নেকড়ে তাদের তাড়া করে না, প্রায় খাড়াই পাহাড় বেয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে যাবার যে সামর্থ্য আছে ছাগলের, নেকড়ে যেন তা হিশেবে রাখে। উপযুক্ত সুযোগ পর্যন্ত অপেক্ষা করে নেকড়ে, তারপর শিকার ধরে বিশেষ শক্তিব্যয় না করে।

নেকড়ে সবচেয়ে বিপজ্জনক বাচ্চাদের পক্ষে, এদের শতকরা ৫০ ভাগই মারা পড়ে নেকড়ের হামলায়।

তবে শিকার যদি হয় কম ক্ষিপ্র, বা অসুবিধাজনক অবস্থায় থাকে, তাহলে নেকড়েরাও তাড়া করে বই কি। যেমন, ঘন তুষারকণায় ঢাকা জায়গায় খুরওয়ালা জন্তুদের পা জড়িয়ে যায়, সেখানে নেকড়ে তাদের ওপর আক্রমণ করে, অবাধে ছুটে গিয়ে তারা অনায়াসে শিকার ধরে।

স্তেপের দ্রুতগামী হরিণ মাদী জাইরানের সঙ্গে যদি বাচ্চা-কাচ্চা থাকে, তাহলে তাড়াহুড়ো না করে নেকড়ে তার পেছু নেয়। জীববিদ ম. দ. জ্ভেরেভ আমায় বলেছিলেন, একবার নেকড়ে দেখেও জাইরান পালায় নি, তার বাচ্চাটা ছিল ঝোপের তলে, তার খানিকটা দূরে সে ঘুরঘুর করে।

এরোপ্লেন থেকে তোলা একটা মজার ফোটো দেখেছিলাম। তাতে ছিল একপাল সাইগাক হরিণ ছুটছে তেমন জোরে নয়, আর পালের ভেতর রয়েছে একটা নেকড়ে।

শিকারের ব্যাপারে পাখিরাও তাড়াহুড়ো করে না। যেমন, হাঁসের ছানা দেখে তক্ষুনি ছোঁ মারে না কাক। ভারিক্কী ভাব করে তা ছানার সারির পেছন থেকে পায়ে পায়ে এগোয়। তারপর হাঁস আর ছানারা যখন তার দিকে আর মন দেয় না, তখন সবচেয়ে পেছনকার ছানাটিকে সে ঠোঁটে তুলে নিয়ে উড়ে যায়।

মৃত্যুর মুখে

১৯৩৪ সালের বসন্তে মস্কোর চিড়িয়াখানায় প্রথম বাচ্চা দেয় আবওয়ালা আফ্রিকান বন-শুয়োর। সাতটি বাচ্চা হয় তার, কিন্তু আদৌ তার যেন কোনো মাতৃস্নেহ নেই দেখে অবাক লাগত। লোকেদের কাছ থেকে সে তার ছানাদের রক্ষা করত হিংস্রভাবে, কিন্তু নিজে সে ঘুরে বেড়াত বাচ্চাদের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে, তখনো বাচ্চাগুলো তেমন চটপটে নয়, যেকোনো মুহূর্তে চাপা পড়তে পারত।

তবে প্রথম দিন থেকেই আবওয়ালীর ছানারা দেখা গেল অসাধারণ চটপটে, চঞ্চল, ক্ষিপ্র।

মা জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেই তারা মায়ের খুর থেকে আত্মরক্ষা করে ছুটে যেত দিগ্বিদিকে।

এমনকি যখন তাদের খিদে পেত, মাই চুষতে আসত, তখনো ভারি হুঁশিয়ার থাকত তারা, মায়ের এতটুকু নড়াচড়াতেই চট করে লাফিয়ে পালাত।

তাহলেও সাতটার মধ্যে দুটো বাচ্চা মারা গেল মায়ের খুরের তলায়।

এরা ছিল সবচেয়ে দুর্বল, অন্যদের চেয়ে কম চটপটে।

ব্যাপারটা কী?

সত্যিই কি আবওয়ালীর বাৎসল্যবোধ নেই?

অবশ্যই আছে। তবে সেটা খুবই স্বকীয় ধরনের। আবওয়ালাদের প্রাকৃতিক নির্বাচন শুরু হয় জন্মগ্রহণের মুহূর্ত থেকেই।

বাচ্চাদের নিয়ে মায়ের যে অতটা আপাতদৃশ্যমান অযত্ন, সেটা সবচেয়ে প্রাণশক্তিমানদেরই টিকে থাকতে সাহায্য করে। জাতটার ভবিষ্যৎ বিকাশ নিশ্চিত

হয় এই ধরনের বাচ্চা দিয়েই। বন্য জীবনে, ভয়ঙ্কর আফ্রিকান হিংস্র জন্তুদের অবিরাম পরিবেষ্টনে সেটা দরকার।

একটা জিনিস লক্ষণীয়। জন্ম থেকেই আবওয়ালাদের বাচ্চাদের সামনের দু'পায়ের খুরের ওপরকার অংশ থাকে কড়া-পড়া, বড়োদের বেলায় এসব জায়গার চামড়া খুবই মোটা আর রুক্ষ। এই প্রত্যঙ্গগুলোকে ভুল করে বলা হয় 'হাঁটু', খাবার সময় এতে ভর দিয়ে ওরা চলে।

নবজাতকদের ওপরের ঠোঁটে বেশ চোখে পড়ে গর্ত, পরে তার ভেতর দিকে বেরয় দাঁত, বয়স্ক শুয়োরদের বেলায় তা খুবই বিকশিত। তথাকথিত 'হাঁটুতে' ভর দিয়ে এই দাঁতের সাহায্যে এরা গাছের মূল আলগা করে তা ছেঁড়ে।

হাঁসের খাবার

কী খায় বুনো হাঁসেরা?

মনে হবে তার জবাব এমন আর কঠিন কী। গুলি করে মেরে পেট চিরে দেখলেই হবে কী আছে তাতে।

সাধারণত তা করাও হয়। আর হাঁসের পেটে দেখা যায় ঝিল-জলার হোগলাজাতীয় নানা ধরনের উদ্ভিদের বীজ।

হাঁসেদের খাবারের ব্যবস্থা করার জন্যে লোকে তাই ঝিল-জলায় এইসব গাছ লাগায়। অবশ্য অনেকেই দেখেছে যে বুনো হাঁস মাছ, ব্যাঙ, পোকা-টোকাও ধরে, তবে এটাকে মনে করা হত দৈবাৎ, কেননা তার পাকস্থলীতে লক্ষণীয় মাত্রায় এসব খাদ্যের অবশেষ তো পাওয়া যায় নি।

কিন্তু মস্কো চিড়িয়াখানায় যখন সাইবেরিয়া থেকে বড়ো একঝাঁক বুনো হাঁস এল, তখন একেবারেই ধারণা পালটাতে হল। মস্কোয় পেঁছবার আগে দেড় মাস তাদের কাটে ঘাঁটিতে আর পথে।

গোটা পথটা তাদের খাওয়ানো হয় কেবল গম আর মাছ। মস্কোয় আমরা মরে যাওয়া কয়েকটা বুনো হাঁসকে ব্যবচ্ছেদ করি। তাদের পেটে পাওয়া যায় কেবল এক ধরনের হোগলার বীজ।

হাঁসেরা তাহলে কি এই বীজ খেয়েই থাকে? পঁয়তাল্লিশ দিনেও যা হজম হয় নি, সে খাদ্য কার দরকার?

শক্ত এই বীজগুলো পাকস্থলীতে থেকে গেছে তা হজম হয় নি বলেই।

ছোটো ছোটো কোয়ার্টজ পাথরের সঙ্গে মিলে এই শক্ত বীজগুলো এক ধরনের যাঁতার কাজ করে দ্রুত খাদ্য পিষে ফেলত।

কিন্তু তাহলে কী খায় হাঁসেরা?
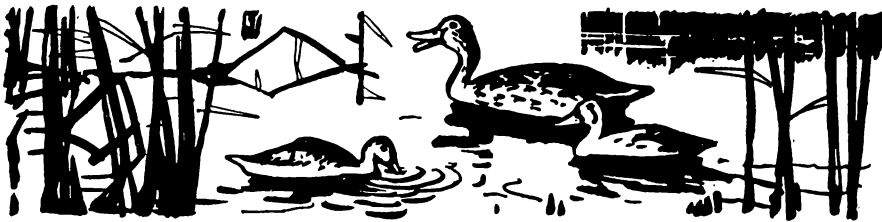
চিড়িয়াখানায় আমরা ঠিক করলাম, জলচর পাখির পরিপাক যন্ত্রে আমিষ খাদ্যের অবশেষ কেন থাকে না সেটা আরো যথাযথভাবে পরখ করতে হবে।

বুনো হাঁসকে আমরা নির্দিষ্ট পরিমাণ এক-একটা খাদ্য খাইয়ে কিছুক্ষণ পরে তাদের ব্যবচ্ছেদ করে পাকস্থলী ও নাড়িতে কী আছে তা দেখতে লাগলাম।

প্রথম যে মদ্দা হাঁসটাকে আমরা মাছ, কেঁচো, শামুক খাইয়েছিলাম, বিশ মিনিট পরে তার পেট কেটে এসবের কোনো চিহ্নই দেখা গেল না। দ্বিতীয় হাঁসটাকে আমরা কাটি খাবার দেবার পনের মিনিট এবং তৃতীয়টাকে দশ মিনিট পরে।

ফলাফলটা দাঁড়াল এই: গৃহীত খাদ্যের কোনো অবশেষই পাওয়া গেল না পাকস্থলীতে! একটা আঁশও মিলল না, যদিও অন্যান্য পশুর ক্ষেত্রে হলদে পাইক মাছের বড়ো আঁশ হজম হতে সময় লাগে অনেক।

অত তাড়াতাড়ি হজমের আশ্চর্য শক্তি সম্পর্কে ধারণা না থাকায় হাঁসের খাদ্য বিষয়ে ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত টানা হয়েছিল।

অবিশ্যি, হাঁসের খাদ্যে অনেক উদ্ভিদেরই একটা নির্দিষ্ট তাৎপর্য আছে, কিন্তু কেউ যদি বুনো হাঁসকে শুধু জলার উদ্ভিদের শক্ত বীজ খাইয়েই রাখতে চায়, তবে অচিরেই তারা মারা পড়বে খিদেয়।

সন্ধ্যায় বুনো হাঁসেরা উড়ে যায় মাঠ বা বনের ফাঁকায়, এবং প্রচুর কেঁচো খায় সেখানে, রাত্রির দিকে কেঁচোগুলো বেরিয়ে আসে মাটি থেকে।

দু'-তিন মিনিটের মধ্যেই কেঁচোগুলো গলে যায় তাদের পাচক রসে, পড়ে থাকে কেবল কেঁচোর পেটের ভেতরকার কিছু কালো মাটি।

ছোটো ছোটো কাদাখোঁচা আর দোয়েলজাতীয় পাখির পাকস্থলীও ঠিক এমনি ফাঁকা থাকে। এদের প্রায় সর্বদাই দেখা যায় অগভীর জলের কাছে।

এই এরা জলের দিকে এগোয়, ঢেউ আসতেই আবার পেছিয়ে যায়, মনে হয় যেন নাচছে বালির ওপর। আর ঢেউ ভেঙে পড়ে সরে যেতেই এরা পরের বার ফেনিল ঢেউ আসার আগেই ভেজা বালিতে কীসব খোঁজে।

এদের গুলি করে সঙ্গে সঙ্গেই পেট চিরে দেখেছি আমরা, কিন্তু পাকস্থলীতে পেয়েছি কেবল বালি।

এ আবার কী! বালি খাবার জন্যে তো পাখি আর এখানে আসে নি!

এ প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্যে তরঙ্গভঙ্গের যে ফালিটায় পাখিদের অত আগ্রহ, সেখানকার পলি নিয়ে মিহি চালুনিতে তা ছেঁকে দেখে কিশোর জীববিদরা। চালুনিতে পাওয়া যায় অসংখ্য সরু সরু কৃমি।

এই হল তীরে নাচিয়ে কাদাখোঁচা, দোয়েলদের শিকার। দেখা গেল, ঢেউ সরে যেতেই কৃমিরা নড়েচড়ে উঠে পলি থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। পরের ঢেউ না আসার আগেই পাখিরা তাদের ধরে ফেলে, আর দু'-তিন মিনিটের মধ্যেই এই কৃমিরা পুরোপুরি গলে যায় তাদের পাকস্থলীতে।

পরে গবেষণা করে দেখা গেল যে সব ধরনের পাখিদের বেলাতেই পরিপাক ক্রিয়া চলে প্রায় একই রকম দ্রুত।

গ্রীষ্মের শেষে বুনো হাঁসরা উড়ে যায় পানা-ঢাকা পুকুরে খাবারের সন্ধানে। প্রশ্ন ওঠে, কেন ঠিক নির্দিষ্ট পুকুরগুলোতেই তারা আসে? কেননা পানা তো থাকে সব পুকুরেই। গুলি করে মারা হাঁস থেকে দেখা গেল এসব জলাশয়ে শুধু এক ধরনের পানাই আছে তাই নয়, প্রজাপতির শুঁয়োপোকাও আছে প্রচুর। ভাসমান পানার ওপর এই প্রজাপতিরা ডিম পাড়ে। ডিমফুটে শুঁয়োপোকারা খায় নরম ভাসমান পাতা। পানার সঙ্গে হাঁসেরা এই শুঁয়োপোকাগুলোকেও গিলে খায়। তবে প্রত্যেক জলাশয়েই এই ধরনের শুঁয়োপোকা জন্মায় তা নয়, তাই বুনো হাঁসেরা যায় তাদের বাছাই করা জলায়।

কাক

নদীর বালুময় অগভীর একটা জায়গার ওপর ধীরে ধীরে উড়ছিল কাক। প্রায় শেষ শক্তি নিঃশেষ করে সে যেন তার ডানা নাড়ছিল গুরুভার অনিশ্চিত ভঙ্গিতে। নিশ্চয় খিদেয় কাহিল হয়ে পড়েছিল কাকটা।

হঠাৎ পাখিটা এক জায়গায় স্থির হয়ে ভেসে রইল। প্রথমটা সে কী যেন লক্ষ্য করলে। তারপর নিচে নেমে এল অল্প জলে পড়ে থাকা একটা শামুকের দিকে। সেটাকে ঠোঁটে করে কাকটা ফের ওপরে উঠে গেল।

কিন্তু পনের মিটার উঁচুতে উঠতে না উঠতেই ঠোঁট ফাঁক করে সেটাকে ফেলে দিলে নিচে। পড়ন্ত শামুকটার সঙ্গে সঙ্গে কাকও নেমে এল নিচে। শামুকটা পড়ল বালিতে, কোনোই ক্ষতি হল না।

তিনবার ওপরে উঠে তিনবারই একই শামুককে ফেলে দিলে কাক।

তাতে একেবারেই সে হয়রান হয়ে গেল। কিন্তু নদীর তীরে খানিকটা জিরিয়ে নিয়ে সে ফের ওপরে উঠল কয়েক মিটার, একটা পাথুরে ঢিপির ওপর খানিক পাক দিয়ে ফিরে এল শামুকটার কাছে।

চতুর্থ বার কাক শামুকটাকে ফেললে কেবল তখন,

যখন নিচে দেখা গেল পাথর। এবার শেষ পর্যন্ত ভেঙে গেল তার চুনা-পাথুরে খোলা। শক্ত পায়ে শামুকের খোলা আঁকড়ে ধরে ক্ষুধার্ত পাখিটা লোভীর মতো ঠোকরাতে লাগল ভেতরকার মাংসে।

এ কাহিনীটা আমায় চিঠিতে জানান আ. সেদিখ, কাকের অধ্যবসায় দেখে অবাক হয়ে যান তিনি। সত্যিই, বাস্তব জীবনের পরিস্থিতি বহু প্রাণীর মধ্যেই এমন কতকগুলো অভ্যাস গড়ে উঠেছে, যাতে বেশ সংকটজনক অবস্থা থেকেও পরিত্রাণ পেয়ে যায় তারা।

ছাতারে-কাদাখোঁচারা শামুকের খোলা ভাঙে একটু অন্যভাবে। ঠোঁটে নিয়ে সেটাকে সে পাথরে ঠুকে ঠুকে ভাঙে।

অন্যান্য পাখির মধ্যে কাকের মস্তিষ্কই বেশি বিকশিত। তাই কাককে পর্যবেক্ষণ করে অতি কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা দেখা যায় প্রায়ই।

উরাল থেকে এই রকম একটা ঘটনার কথা আমাদের লিখে জানান শিকারী কচিওনি।

উরালে কাজ করার সময় এই খনি-ইঞ্জিনিয়রটি 'হাত মক্স করার' জন্যে রোজ কাকদের গুলি করতে শুরু করেন। কিন্তু দু'তিন দিন পরেই দূরে তাদের শত্রুকে দেখতে পাওয়া মাত্র কাকেরা উড়ে যেত আর গুলির পাল্লা পেরিয়ে গিয়ে তবেই বসত পাইন গাছের ডগায়।

তখন সব রকম সাবধানতার সঙ্গে ইঞ্জিনিয়র ওঁৎ পাতলে গোলা-ঘরে, যে আস্তাকুঁড়টার কাছে কাকেরা সাধারণত জটলা করত, তা থেকে অল্প দূরে।

কিন্তু ওঁৎ পাতার জায়গায় ওঁকে ঢুকতে দেখেই কাকেরা মুহূর্তে উড়ে গিয়ে পাইন গাছ ছেয়ে ফেলে। আস্তাকুঁড়টায় তারা নেমে আসে কেবল ইঞ্জিনিয়র জায়গাটা ছেড়ে যাবার পরে।

পরের দিন ইঞ্জিনিয়র গোলা-ঘরে ঢোকেন আরেকজন সঙ্গী নিয়ে, মিনিট দুয়েক পরেই লোকটা পাইন গাছে বসা কাকেদের সামনে দিয়ে ফিরে যায়। পরিকল্পনাটা খুব সহজ: কাকেরা দেখবে একটা লোক বেরিয়ে চলে যাচ্ছে, তখন ফের আস্তাকুঁড়ে নেমে আসবে।

কিন্তু এতেও তাদের ঠকানো গেল না। বেজার হয়ে ইঞ্জিনিয়র প্রাতরাশের জন্যে বাড়ি ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত একটা কাকও ত্যাগ করল না তাদের নিরাপদ ঘাঁটি।

অসফল শিকারীর একেবারে আঁতে ঘা লাগল: উচ্চ শিক্ষায়তন থেকে ভালো-ভাবে পাশ-করা ডিপ্লোমা-পাওয়া একটা লোক কিনা পেরে উঠছে না সাধারণ কাকেদের সঙ্গে!

এবার তিনি গোলা-ঘরে ঢুকলেন দু'জন সঙ্গী নিয়ে, তারপর ফেরত পাঠালেন তাদের।

তারা অদৃশ্য হতে ইঞ্জিনিয়র আশা-ভরে তাকিয়ে রইলেন ফাটলের মধ্য দিয়ে... কাকগুলো কিন্তু বসেই রইল গাছে।

'না, হার মানব না!' এই স্থির করে শিকারী গোলা-ঘরে ঢুকলেন তিন জন সঙ্গী নিয়ে।

এইবার তাঁর জয়ের পালা! তিন জনেই যখন গোলা-ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোন পেরিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকল, তখন ঝাঁক বেঁধে কাকেরা নেমে এল আস্তাকুঁড়ে।

চিঠিতে কমরেড কচিওনি লিখেছেন, 'দৈবাৎ করে ফেলা এই পরীক্ষাটা থেকে একটা সিদ্ধান্ত টানা যায়: লোকে প্রায়ই কাকেদের গোণে, কাকেরাও মানুষ গোণে, যদিও তিনের বেশি গণনা-শক্তি তাদের নেই।'

ব্যাপারটা গোণা নিয়ে? খুবই সম্ভব যে কাকেরা তাদের 'শত্রুর' চেহারাটা মনে করে রেখেছিল, চলে-যাওয়া লোকগুলোর মধ্যে তাকে দেখতে না পাওয়া পর্যন্ত গাছের ডগা থেকে নামত না। কিন্তু গোলা-ঘর থেকে যখন তিন জন বেরিয়ে ঘেঁষাঘেঁষি করে আঙিনা ছেড়ে যায়, তখন অন্য কাউকে শিকারী বলে ভুল করা তাদের পক্ষে খুবই সম্ভব।

সাধারণত লোকের মুখ আর চেহারা চমৎকার মনে রাখতে পারে কাকেরা, বিশেষ করে যারা তাদের জ্বালায়।

তোরাঙ্গিকোল হ্রদে
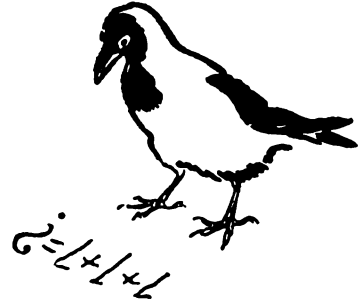
ইর্‌তীশ নদীর উজান এলাকা পর্যবেক্ষণ করার সময় তোরাঙ্গিকোল হ্রদের উপকূলে ঝোপের মধ্যে শিপুন-জাতের একটা রাজহাঁস পরিবার আমার চোখে পড়ে এবং তাদের লক্ষ্য করতে থাকি।

মা-বাপ ছাড়া সংসারটিতে ছিল আরো তিনটি ধূসর রঙের বাচ্চা। তখন হেমন্ত, দক্ষিণে উড়ে যাবার তোড়জোড় করছিল তারা। হ্রদ ছেড়ে তাদের বাসাটা থেকে পাঁচ কিলোমিটার পর্যন্ত উড়েও গেল। হঠাৎ একটা বাচ্চা উড়ন্ত পাখির দল ছেড়ে ফিরে এল আবার। তার পেছু পেছু ফিরল বাকিরাও। অনেকখন বাতাসে পাক খেল ধাড়ী-

দ্বটো, নানাভাবে সপরিবারে উড়ে যাবার জন্যে বাচ্চাটাকে উসকাল তারা। শেষ পর্যন্ত বাচ্চাটা তাদের সঙ্গেই উড়ে গেল, কিন্তু আবার ফিরে এল।'

এই চলল কয়েক বার। বাসা পাতার জায়গাটার বার বার চক্কর দিলে দ্বটো ধাড়ী আর দ্বটো বাচ্চা। অন্য বাচ্চাটা ওদের সঙ্গে উড়ে যাচ্ছিল, কিন্তু অচেনা জায়গায় পৌঁছতেই আবার ফিরে আসছিল। শেষ পর্যন্ত গোটা সংসার উড়েই গেল, হ্রদে আর ফিরল না, শ্বধ্ব বাচ্চাটা রইল শীত ভুগতে।

জোরালো দ্বরবীণ দিয়ে আমি রয়ে-যাওয়া রাজহাঁসটাকে দেখতে লাগলাম। বাইরে থেকে সে দেখতে স্বস্থ-সমর্থ, কোনো ত্রুটি নেই, তবে ক্যাঁ-ক্যাঁ করে ডাকছিল আর খ্বঁজছিল তার মা-বাপকে। ব্যাপারটা কী? তোরাঙ্গিকোল-বাসী অন্যান্য রাজহাঁসের সঙ্গে হেমন্তে সে উষ্ণ দেশে উড়ে গেল না কেন?

হয়ত ঋতুচক্র মেনে উড়ে যাবার প্রেরণা পাখিটার মধ্যে নেই? তোরাঙ্গিকোলের তীর ছেড়ে আসার সময় বেশ ব্বঝলাম, ও আর তার আত্ম-পরিজনের ম্বখ দেখবে না কখনো, আরো উত্তরের কোনো হ্রদ থেকে উড়ে আসা অন্যান্য রাজহাঁসদের দলে যদি সে না ভেড়ে, তাহলে শীতের ঠাণ্ডায় তার মৃত্যু অনিবার্য।

যাযাবর পাখিদের মধ্যে উড়ে যাবার প্রবণতার এই অভাব দেখা যায় কদাচিৎ। তাই স্বভাবতই ভিয়াজমা শহরের উপকণ্ঠে কতকগ্বলো যাযাবর দাঁড়কাককে শীত কাটাতে দেখে আমরা তার কারণ জানতে কৌতূহলী হয়ে উঠি।

এই ধরনের পনেরোটা কাককে গ্বলি করে মারি আমরা। দেখা গেল, সবকটারই কোনো-না-কোনো খ্বঁত আছে। যেমন, একটার নিচের চোয়ালের আধখানা নেই,

কখনো নিশ্চয় গুলিতে খসে গেছে; আরেকটার কোনো এক সময় পাখার হাড় ভেঙে গিয়েছিল, সেটা ঠিকমতো জুড়ে ওঠে নি। আরেকটার দুটো আঙুল নেই; আরেকটার পেশীর গভীরে ঢুকে গেছে ছর্‌রা। সবকটারই এক-একটা ত্রুটি। এইসব ক্ষতির ফলেই কাকগুলো লম্বা পাড়ি খারিজ করতে বাধ্য হয়।

মস্কোর চিড়িয়াখানায় বহু জাতের বুনো হাঁসের মধ্যে দেখা যায় বসন্তে ও শরতে উড়ে যাওয়ার তীব্র প্রবণতা, কিন্তু মস্কোতেই তারা থাকে একমাত্র এইজন্যে যে তাদের পাখার ডগার হাড়টা কেটে ফেলা। এসব হাঁস আকাশের অনেক উঁচুতে ওঠে, শহরের ওপর ওড়ে অনেকখন ধরে, কিন্তু বেশি দূরে পাড়ি দেয় না। পাখার ডগা-কাটা পেলিকানরাও বসন্ত ও শরতে মস্কোর রাস্তার ওপর দিয়ে উড়ে যায়, কিন্তু তারপর সর্বদাই চিড়িয়াখানায় ফিরে আসে, শীত কাটায় মস্কোতেই। খুবই সম্ভব যে তোরাঙ্গিকোল হ্রদে শীত কাটাবার জন্যে যে রাজহাঁসটা রয়ে গেল, তারো কোনো অঙ্গহানি ছিল।

অপ্রত্যাশিত পাটীগণিত

ভালুকের ছানারা যেখানে খেলছিল, সেখানে জুটল একদল দর্শক।

ভল্লুক পরিবারের ইতিহাস বলতে গিয়ে গাইড হঠাৎ জিজ্ঞেস করল:

'পাটীগণিত আপনারা নিশ্চয় জানেন? তাহলে কষুন তো: মানুষের বেলায় সদ্যোজাত শিশুর ওজন হয় তিন-চার কিলোগ্রাম, তাহলে ৫ মনী ওজনের ভালুক-মায়ের বাচ্চার ওজন হবে কত?'

'নিশ্চয় আট-নয় কিলো,' বললে কে যেন।

'বলেন কী! অনেক বেশি!' মন্তব্য করলে আরেকজন। 'ভালুকের ওজন তো প্রায় গরুর সমান, অথচ সদ্যোজাত বাছুরের ওজন কমসে কম মনখানেক।'

নানানভাবে 'অংকটা' কষতে লাগল সবাই, কিন্তু সঠিক উত্তর কেউ দিতে পারল না, কেননা পাঁচ-ছয় কিলোগ্রামের কম ওজন বলতে সাহস হচ্ছিল না কারো।

সত্যিই, কল্পনা করা কঠিন যে অতিকায় ভল্লুকীর সদ্যোজাত শিশুর ওজন গড়ে মাত্র আধ-কিলোগ্রাম, একটা ধেড়ে ইঁদুরের সমান।

অথচ গৃহপালিত ভেড়ার বাচ্চা হয় সাধারণত তার চেয়ে দশগুণ ভারি।

সেবল নেউলের বাচ্চার ওজন প্রায় তিরিশ গ্রাম, অথচ মেঠো বেড়ালের বাচ্চা দশ গ্রাম।

নবজাতকের সঙ্গে তার মায়ের ওজন তুলনা করলে দেখা যাবে যে ভালুক-ছানা তার মায়ের ওজনের ০. ২৭ শতাংশ, সেবল-ছানা প্রায় ৩ শতাংশ আর ভেড়ার বাচ্চা প্রায় ১০ শতাংশ।

জীবনের প্রথম দশ দিনে মেঠো বেড়ালদের ওজন বাড়ে দৈনিক প্রায় ২৪ গ্রাম, সেবলদের — প্রায় ১০ গ্রাম, ভেড়ার বাচ্চার প্রায় ১৮০ আর ভালুক-ছানার মাত্র ২·৫ গ্রাম করে।

ব্যাপারটা কী? প্রকৃতিতে এমন বিচিত্র অনুপাত কেন?

ভালুক বাচ্চা দেয় শীতে, জানুয়ারি মাসে। একেবারে বসন্ত না আসা পর্যন্ত সে গুহা থেকে বেরয় না, দেহের মধ্যে সেই শরতে সঞ্চিত চর্বি আর অন্যান্য
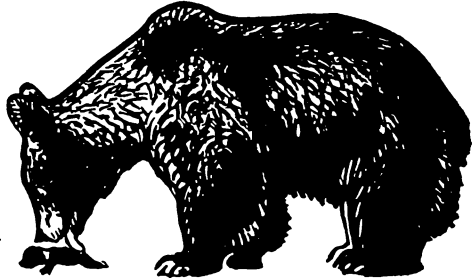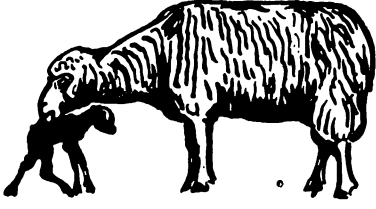
পুষ্টি খরচ করেই সে দুধ খাওয়ায় বাচ্চাদের। শীতে ভল্লুকীর দেহযন্ত্রে এসব জিনিসের জোগান হয় না একবারও — এমনকি জলও সে খায় না।

বোঝাই যায় যে এ অবস্থায় ভল্লুকী-মায়ের পক্ষে বসন্ত পর্যন্ত দুধ খাইয়ে যাওয়া সম্ভব কেবল বাচ্চা অতি ক্ষুদে হলেই।

আর ভালুক-ছানা যদি হত বাছুরের মতো বড়ো, তাহলে দৈনিক সে দুধ খেত অন্তত আধ-বালতি।

এতে দ্রুত শীর্ণ হয়ে পড়ত ভল্লুকী, গোটা সংসারই ধ্বংস পেত। তবে জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেয় প্রাণীরা।

বসন্ত পর্যন্ত ভালুক-ছানা বাড়ে অতি ধীরে ধীরে। বসন্তে মায়ের সঙ্গে যখন তারা গুহা থেকে বাইরে বেরতে শুরু করে, 'সূর্য-স্নান' নেয় আর নানা ধরনের খাদ্য খেতে থাকে প্রচুর, কেবল তখনই অবস্থাটা বদলায়।

এই সময় তারা খায় গত বছর থেকে পড়ে থাকা বেরি, গাছ-গাছড়ার কন্দ, সেই সঙ্গে পিঁপড়ে, কেঁচো, শুঁয়োপোকা, ইঁদুর, মাছ — সংক্ষেপে, প্রকৃতির বাসন্তী জাগরণের সময় খাদ্য পদবাচ্য যাকিছু পাওয়া যায়।

এই সময় থেকে ভালুক-ছানারা বড়ো হয়ে উঠতে থাকে অনেক তাড়াতাড়ি।

ভেড়ার ছানা এবং সাধারণভাবে তৃণভোজী জন্তুর ছানারা যে দুধ খেয়ে বড়ো হয়, তা সরাসরি উৎপাদিত হয় সারা বছর ধরে খাওয়া খাদ্য থেকে।

তার ওপর আবার তৃণভোজীদের ছানারা ঘাস খেতে শুরু করে অনেক তাড়াতাড়ি।

সেইজন্যেই জন্মের প্রথম দিন থেকেই তারা বেড়ে উঠতে থাকে অনেক দ্রুত।

ছোটো ছোটো শিকারী জন্তু — সেবল, মেঠো বেড়াল, মার্টিন — এদের বাচ্চারা হয় তুলনায় ক্ষুদ্রাকার।

এতে এমনকি পরিণত গর্ভাবস্থাতেও শিকার করে খাদ্য-সংগ্রহ এদের পক্ষে সম্ভব হয়, কেননা তখনো বজায় থাকে তাদের ক্ষিপ্রতা আর গতিশীলতা।

ব্যাপারটা অন্য রকম হলে ইঁদুর, পাখি, কিছুই তাদের জুটত না।

ছোটো ছোটো শিকারী জন্তুর বাচ্চারা বড়ো হয়ে ওঠে তাড়াতাড়ি, প্রথম দশ দিনে তাদের ওজন বাড়ে প্রায় ৩০০ শতাংশ। এদের সামনের দাঁত ওঠে কশের দাঁতের চেয়ে অনেক পরে। আপাতদৃষ্টিতে বৈশিষ্ট্যটা তেমন গুরুতর নয়, অথচ এর ফলেই বাচ্চারা মাই জখম না করে বহুদিন ধরে মায়ের দুধ খেয়ে যেতে পারে। সেবল আর মেঠো বেড়ালদের বাচ্চার চোখ ফোটে কেবল তাদের প্রচণ্ড বাড়ের সময়, চৌত্রিশ, কখনো বা ছত্রিশ দিন পরে।

গ্লাইডার-ঈগল

তখন সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি। সাভেলভ রেলপথের ইক্শা স্টেশন থেকে কিছু দূরে উডককজাতীয় স্নাইপ শিকার করছিলাম। সেখানে পালকওয়ালা 'গ্লাইডারদের' ওড়া লক্ষ্য করার সুযোগ হয় আমার।

সীমাহীন বনাঞ্চলের ওপরে দক্ষিণ দিকে উড়ে যাচ্ছিল একজোড়া ঈগল। ডানা নাড়াচ্ছিল তারা কেমন ভারাক্রান্ত ভঙ্গিতে, মাটি থেকে শতখানেক মিটার উঁচুতে। বোঝা যাচ্ছিল, অনেকটা পথ পাড়ি দিয়ে আসায় হাঁপিয়ে পড়েছে। শেষ পর্যন্ত একটা ফাঁকায় এসে নিশ্চলভাবে ডানা ছড়িয়ে শোঁ শোঁ করে ওপরে উঠতে লাগল। মাঠটার ওপর পাক খেতে খেতে তারা এমনভাবে উঁচুতে উঠছিল, যেন প্রবল কোনো চুম্বক তাদের টেনে নিচ্ছে মেঘের কোলে। মিনিট দশেকের মধ্যেই বড়ো বড়ো এই পাখি-দুটোকে দেখাল বিন্দুর মতো। তখন ফের তারা পাড়ি দিতে লাগল দক্ষিণ দিকে, তবে পেশীর জোর না খাটিয়ে: বাতাসে ভেসে চলল তারা, হুবহু যেন সত্যিকারের গ্লাইডার, একেবারে ডানা নাড়াচ্ছিল না তারা। ধীরে ধীরে যেন পাহাড়ের ঢালু বেয়ে নামতে নামতে তারা শিগ্গিরই অদৃশ্য হয়ে গেল দিগন্তে।

সত্যি বলতে কি, এ ওড়ায় অসাধারণ কিছু নেই: বাতাসে নিশ্চল ডানায়

পাক খেয়ে ঈগল ওপরে উঠে যাচ্ছে — এ দেখতে তো আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু বনের ওপর দিয়ে ওড়ার সময় ঈগল-দুটো অত প্রাণপণে ডানা নাড়ছিল কেন তাহলে? তার কারণ বনে ঢাকা মাটির চেয়ে খোলা মাঠ রোদে গরম হয় বেশি, সেখান থেকে জোরালো বায়ুস্রোত উঠতে থাকে ওপরে। উঁচুতে ওঠার জন্যে এই স্রোতটাকেই কাজে লাগায় ঈগলেরা, তারপর সেখান থেকে অনেকখন ধরে শক্তিক্ষয় না করে ভেসে যেতে পারে। গ্লাইডার, যে উড্ডয়নযন্ত্রে ইঞ্জিন নেই, সঞ্চলনশীল ডানা নেই, তাও কি ঠিক এই-ই করে না?

আকাশবিহারের বড়ো একটা অংশ ঈগল সাধারণত পাড়ি দেয় বাতাসে ভেসে। সেইজন্যেই থেকে থেকে মাঠের ওপর পাক খেতে খেতে প্রচণ্ড উঁচুতে উঠে যায় তারা।

যে ঈগল-দুটোকে আমি দেখি, বোঝা যায়, তারা বনের ওপর উড়েছিল অনেকখন। উঁচুতে ওঠার সব ক্ষমতা ফুরিয়ে গিয়েছিল তাদের, পথে এমন কোনো ফাঁকা মাঠ পড়ে নি, যেখানে হাওয়ার স্রোতের জোরে ওপরে উঠতে পারে তারা। জেরবার হয়ে তারা উড়ছিল নিচুতে, প্রায় গাছগুলোর মাথা ছুঁয়ে, ঘন ঘন নাড়ছিল তাদের বিপুল ডানা।

যে গ্লাইডার বা বিমানে উড়েছে, তাদেরও অবস্থা হয় ঐ ঈগল-দুটোর মতো। বনের ওপর দিয়ে ওড়ার সময় বিমান প্রায়ই যেন নিচে 'পড়ে যায়', কেননা যেখানে বাতাসের ঊর্ধ্ব-স্রোত নেই, সেখানে মাটি সাধারণত বিমানকে 'টেনে ধরে'।

পাখির ওড়া থেকে বৈমানিকদের শেখার আছে অনেককিছু। বিমান ও গ্লাইডারের ডিজাইনাররা যে বাতাসে পাখিদের ওড়ার পরিস্থিতি ও পদ্ধতি খুঁটিয়ে অনুধাবন করেন, সেটা অকারণে নয়।

বন্দিদশায় ও স্বাভাবিক অবস্থায় পাখিদের বংশবৃদ্ধি

মস্কোর চিড়িয়াখানায় সবুজ সবুজ, ঝিলমিলে অস্ট্রেলীয় টিয়া পাখি আছে প্রচুর, থাকে তারা জালি তার ঘেরা বড়ো বড়ো খাঁচায়। ছিমছাম চঞ্চল এই পাখিগুলো তাদের উচ্ছল কিচির-মিচিরে বাতাস ভরে তোলে।

স্বদেশে, অস্ট্রেলিয়ায় তারা বাচ্চা পাড়ে গাছের কোটরে, আমাদের দেশের ফিঞ্চ বা থ্রাশ পাখির মতো কখনোই খোলা বাসা বানায় না। সামনে ঢোকার ফুটো রেখে কাঠের ছোটো ছোটো ঢাকা বাক্স টাঙিয়ে দিলে চিড়িয়াখানাতেও এই অস্ট্রেলীয় বন্দীরা ছোটো ছোটো শাদা ডিম দিতে থাকে কেবল তাতেই।

শুধু এই ঢাকা বাক্স আর কৃত্রিম কোটর ছাড়া অন্য কোনো বাসাতেই বাচ্চা দেয় নি টিয়ারা।

একবার, ডিম পাড়ার ঠিক মরশুমের সময় আমরা কাঠের বাসা আর কৃত্রিম কোটরগুলো সরিয়ে নিই, ভেবেছিলাম, ডিম পাড়ার আসন্ন বেগ তাতে আটকাবে না, খাঁচার মেঝেতেই ডিম দেবে। কিন্তু সেটা হল না। কাঠের বাসাগুলো সরিয়ে নিতেই জুড়ি বাঁধা টিয়াগুলোর মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল, বন্ধ হল ডিম পাড়া। কাঠের বাক্সগুলো ফের টাঙাতে দ্বিতীয় বার সজীবতা শুরু হল, জুড়িতে জুড়িতে ফের ভাগ হয়ে গেল টিয়ারা, ডিম পাড়ল, তা দিল, আর ১৬ দিন পর তা থেকে ফুটে বেরল ন্যাংটা ন্যাংটা বাচ্চা, মা-বাপ দু'জনেই তাদের খাওয়াতে লাগল তাদের উদ্গার দিয়ে।

একজন কিশোর জীববিদ জিজ্ঞেস করলে:
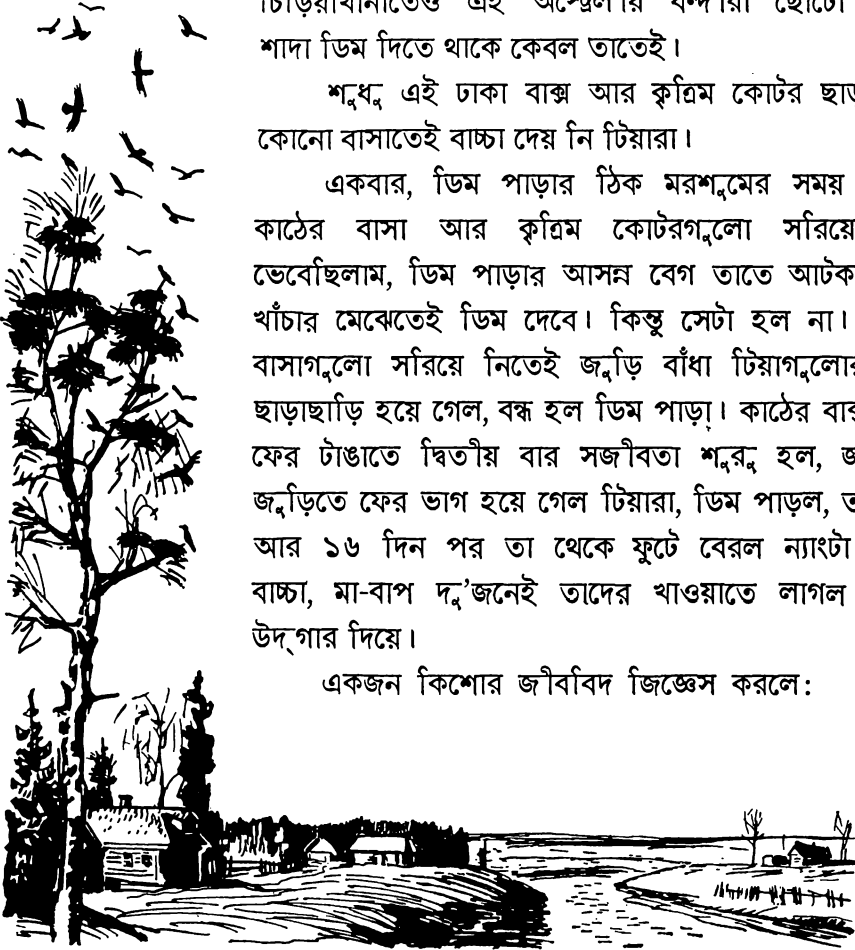
‘চিড়িয়াখানায় অধিকাংশ পাখি যে বাচ্চা দেয় না, সে কি এইজন্যে নয় যে প্রকৃতিতে হাজার হাজার বছর ধরে বিভিন্ন পাখি যে পরিস্থিতিতে বাসা বেঁধে এসেছে তা এখানে নেই? পরিবেশের সুনির্দিষ্ট একটা পরিস্থিতিতে জন্মগত প্রতিক্রিয়া গড়ে উঠেছে ব’লেই কি, ই. প. পাভলভ যাকে বলেছেন “অনপেক্ষ প্রতিবর্ত” ?’
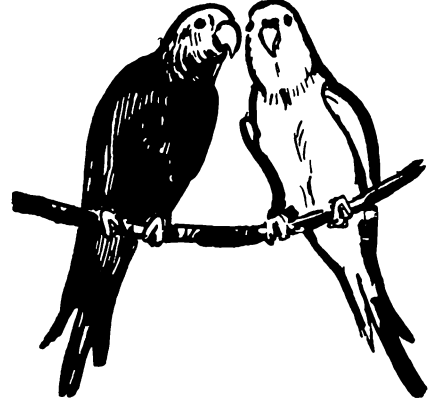
বললাম, ‘অনুমান করার চেষ্টা না করে, যেসব পাখি বছরের পর বছর চিড়িয়াখানায় থাকলেও কিছুতেই ডিম দিচ্ছে না, তাদের জন্যে বিশেষ পরিস্থিতি গড়ে দেওয়া যাক।’

কাজের ধুম পড়ে গেল: পুকুরের পাড়ে ছেলেরা পাথর এনে ঢিপির মতো বানালে, তাতে রইল খোলা গুহা, নিচে খোঁদল। নতুন এলাকার ঝিলে তারা সারিৎসিনো’র পুকুর থেকে লম্বা লম্বা হোগলার বহু চাপড়া অল্প জলে বসিয়ে দিলে। বুলফিঞ্চ পাখির ডেরায় বসানো হল বেশ উঁচু, ঝাঁকড়া ফার গাছ, জ্বলজ্বলে সবুজ নতুন শাখা তার তখনো বেরয় নি।

চিড়িয়াখানায় যেসব পাখি ডিম দেয় না, বন্য অবস্থায় তারা যেসব প্রাকৃতিক পরিস্থিতিতে বাসা বাঁধত, চিড়িয়াখানার রূপান্তরিত অংশগুলো হল তার অনুরূপ। সবাই অধীর হয়ে রইলাম বসন্তের মরশুমের জন্যে। অবশেষে মধুঋতু। বড়ো হয়ে উঠতে লাগল দিন, আকাশ গুঞ্জরিত হয়ে উঠল ভরত পাখির গানে। দক্ষিণ থেকে উড়ে আসতে শুরু করল পাখির সজীব ঝাঁক। শহরের ওপর দিয়ে অনেক উঁচুতে ত্রিভুজের আকারে উড়ে যেতে থাকল হংস-বলাকার দল আর রাত্রে শোনা গেল তুন্দ্রা-গামী, যাযাবর স্নাইপ পাখির অদ্ভুত, কিন্তু সুরেলা শিস।

চিড়িয়াখানাতেও চঞ্চল হয়ে উঠল শ্বেতগণ্ড হাঁসেরা। কয়েক বছর আগে এদের আনা হয়েছিল নরওয়ের উপকূল থেকে, কিন্তু চিড়িয়াখানায় তারপর একবারও বাচ্চা দেয় নি। এখন তারা হয়ে উঠল উত্তরমুখী, ছুটে জল থেকে উড়ে যাবার চেষ্টা করল তারা, কিন্তু পাশকে ভঙ্গিতে খানিকটা উড়ে অসহায়ের মতো ফের নেমে এল পুকুরে। উড়তে পারে নি, কারণ তাদের ডানার ডগার পালক ছিল কাটা।

দু'সপ্তাহ পরে জলচর পাখিদের উত্তরে উড়ে যাবার মরশুম শেষ হল, শান্ত হয়ে এল শ্বেতগণ্ড হাঁসেরাও। তাদের মনে হতে লাগল যেন কোনো নতুন জায়গায় উড়ে এসেছে। কেবল এর পরেই তারা জুড়ি বেঁধে বেঁধে পাথুরে ঢিপিটায় বাসা বাঁধার মতো জুৎসই জায়গা খুঁজে বেড়াল। যেসব জায়গায় কোনো একটা মাদী বাসা বাঁধা নিয়ে ব্যস্ত সেখানে তার মর্দা অন্য কোনো মর্দাকে ঢুকতে দিত না। অমন ভীরু, চুপচাপ হাঁসগুলো হয়ে উঠল দজ্জাল, খেঁকুরে, শান্ত হল কেবল সবাই বাসা পাবার পর।

শেষ পর্যন্ত ডিমে তা দিতে বসল মাদীরা আর মর্দাগুলো তাদের বাসার সামনে দাঁড়িয়ে অন্য পাখির হামলা থেকে নির্ভয়ে রক্ষা করতে লাগল তাদের।

২৮—২৯ দিন পর ডিম ফুটে ছানা বেরুল, জলে দেখা গেল জোড়ায় জোড়ায় শ্বেতগণ্ড হাঁস, তাদের সঙ্গে ৪—৫টি করে সবজেটে ছানা।

চিড়িয়াখানার ঝিলে বসানো চাপড়াগুলো থেকে যখন হোগলা গজাল এবং সেখানে খুঁড়ে রাখা গর্তগুলো সমেত ভেতর দিকটা একেবারে ঢাকা পড়ে গেল, তখন এমন আরো কতকগুলো জাতের হাঁসের নজর পড়ল সেসব জায়গায়, যারা চিড়িয়াখানায় আগে কখনো বাসা বাঁধত না। জলে বুক দেবে, যেন সবার অলক্ষ্যে চুপিসাড়ে তারা ঢুকে পড়ত হোগলার ভেতরে, পেট থেকে পালক ছিঁড়ে তা বিছাত গর্তগুলোয়, তারপর ডিম দিতে লাগল।

তা দেওয়া শুরু হবার ২৪—২৮ দিনের মধ্যে চিড়িয়াখানার 'ঝিল' ভরে গেল নানা জাতের হাঁসের বাচ্চায়।

ঝাঁকড়া ফার গাছটাও অবহেলিত রইল না: কাঠি, বিচালি আর সেখানকার বাসিন্দা পাখিদের পালক দিয়ে নিপুণভাবে তাতে বাসা বানালে বুলফিঞ্চ পাখিগুলো।

প্রকৃতিতে কী কী পরিস্থিতিতে পাখিদের বংশবৃদ্ধি হয়, তার অধ্যয়ন চালিয়ে আমরা চিড়িয়াখানায় কৃত্রিমভাবে তা গড়ে নিই। এইভাবে ফিঞ্চ, নাইটিঙ্গেল, তিতির, উড-গ্রাউজ প্রভৃতি বহু জাতের পাখিকে বাচ্চা দিতে বাধ্য করেছি আমরা। শুধু ঈগল প্রভৃতি যেসব শিকারী পাখি প্রকৃতিতে বাসা বাঁধে উঁচু উঁচু গাছে, চিড়িয়াখানায় তাদের জন্যে উপযুক্ত পরিস্থিতি গড়ে তোলা যায় নি। তাছাড়া ওড়ার সুযোগ সীমিত থাকায় তাদের ব্যায়াম হত না, তাতে দুর্বল হয়ে পড়ে পেশী, ভেতরকার সমস্ত দেহযন্ত্রের কাজই বিঘ্নিত হয়। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে বেশি রকম ডানা-কাটা লাল হাঁস এবং অন্যান্য যেসব পাখি ওড়ার সুযোগ পায় না, চিড়িয়াখানায় তাদের বাচ্চা হয় না।

প্রকৃতিতে এক-একটা জাতের পাখির পক্ষে বাসা বাঁধার যা বৈশিষ্ট্য, কোনো পাখিকে তা লঙ্ঘন করতে দেখা গেছে কদাচিৎ।

তাই, মরুভূমিতে একবার মাটিতে ঈগল পাখির বাসা দেখে আমার অবাক লেগেছিল, এরা সাধারণত বাসা বাঁধে উঁচু উঁচু গাছে। রাশি রাশি হাড় আর ডাল দিয়ে বাসাটা তৈরি। সেটা খানিকটা তুলতে দেখলাম তলে রয়েছে দেবে যাওরা একটা সাকসাউল গাছ। তখন বুঝলাম, এ ঈগলও তার জাতের অভ্যাস (প্রতিবর্ত ক্রিয়া) বদলায় নি। দেখে মনে হচ্ছে, প্রথমটা সে বাসা বানিয়েছিল গাছেই। সেখানে সে বাচ্চা ফুটিয়েছে বহু বছর ধ'রে আর প্রতিবারই নতুন নতুন মাল-মসলা দিয়ে বাসা সম্পূর্ণ করেছে। শেষে বাসাটা এত ভারি হয়ে ওঠে যে মরুভূমির এই ঠুনকো গাছটা ভেঙে পড়ে আর বাসা সমেত ঈগলও নেমে আসে মাটিতে।

বাসা বাঁধার প্রত্যক্ষ ও বাধ্যতামূলক পরিস্থিতি ছাড়াও আরো কতকগুলো শর্তের ওপরেও বংশবৃদ্ধি নির্ভর করে। যেমন, দাঁড়কাকেরা বাসা বাঁধে সাধারণত পরস্পর খুব কাছাকাছি বড়ো একটা বসতি পেতে।

চিড়িয়াখানায় তারা একবারও ডিম পাড়ে নি, কেননা, মনে হয়, বংশবৃদ্ধির তাগিদ বোধ করার জন্যে বাসা ছাড়াও তাদের আরো দরকার চেঁচামেচি, ডাকাডাকি, পাখার ঝটপট, স্বজাতির নৈকট্য। স্যান্ড-মার্টিন, গোলাপী স্টার্লিঙ্গ প্রভৃতি যেসব পাখি একসঙ্গে বসতি পেতে বাসা বাঁধে, তাদের বেলাতেও এটা প্রয়োজন।

প্রকৃতিতে একলষেঁড়ে পাখিরা সাধারণত খাবার সংগ্রহ করে বাসার আশেপাশের জায়গা থেকে, তাই পরস্পর কাছাকাছি বাসা বাঁধে না তারা। প্রয়োজনীয় দূরত্বটা তারা স্থির করে নেয় নিজেরাই; সচরাচর এ নিয়ে চলে জোড়ায় জোড়ায় ঝগড়া, প্রত্যেক জুড়িই রাখে নিজেদের আলাদা আহার-ক্ষেত্র।

একসঙ্গে বসতি পেতে যারা থাকে: দাঁড়কাক, সিন্ধু-চিল, সোঅলো প্রভৃতিরা খাবারের জন্যে বহুদূর উড়ে যায়, বাসার কাছাকাছি খাদ্য-সংস্থানের ওপর নির্ভর করে না। শিকারী পাখিদেরও শিকারের এলাকা অনেক বড়ো, কেননা ছোটো এলাকায় শিকার মেলা কঠিন।

বিভিন্ন উপকারী পাখির বাসা বাঁধার শর্ত অনুধাবন করা দরকার, সংরক্ষণ করা উচিত তাদের উপযোগী জায়গাগুলো, বসন্তে কেবল কাঠের বাসা টাঙিয়ে রাখলেই যথেষ্ট হয় না, কেননা তাতে ঠাঁই নেয় কেবল অল্প কয়েকটা জাতের কোটরবাসী পাখি।

চলমান বাসা

শেষ পর্যন্ত আমাদের জাহাজ ছাড়ল। আমি ছিলাম গলুইয়ে, চারপাশে রাজ্যের সরঞ্জাম: দড়ি-দড়া, নোঙরের শেকল, হুক এবং আরো কত কী, যার অর্থ কেবল মাঝি-মাল্লাদের কাছেই বোধগম্য। আমি সেগুলো খুঁটিয়ে দেখছিলাম, কেননা ওগুলোরই ভেতর দুটো ছোট্ট পাখি লুকিয়ে পড়েছিল। কিন্তু কোথায়?

পায়ে পায়ে গলুইটা পরীক্ষা করে দেখে শেষ পর্যন্ত পেয়ে গেলাম যা খুঁজছিলাম। গলুইয়ে গুটিয়ে রাখা দড়ার পাকের মধ্যে বাসা পেতেছে ছিমছাম চিফ-চ্যাফ পাখি।

তাতে পাঁচটা ক্ষুদে ক্ষুদে ছানা, তখনো পালক ওঠে নি, ক্ষীণ চিঁচিঁ স্বরে খাবার চাইছিল। মানুষের 'বিপজ্জনক' সান্নিধ্য সত্ত্বেও মা-বাপে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ঘুরঘুর করছিল তাদের চারপাশে।

এটা ঘটে আরল সাগরে, শুটকী মাছ ভরা একটা জাহাজে। যাত্রা শুরুর আগে জাহাজটা দু'সপ্তাহের বেশি তীরে ভিড়ে ছিল মেরামতির জন্যে। এই দাঁড়িয়ে থাকার সময়টা চিফ-চ্যাফ দম্পতি জাহাজের নিশ্চলতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং বাসা বাঁধে সেখানে।

জাহাজ যখন ছাড়ল, তখন সে জাহাজকে অনুসরণ করা ছাড়া ওদের গত্যন্তর রইল না, কেননা তীর থেকে ক্রমেই দূরে জাহাজটা টেনে নিয়ে যাচ্ছিল তাদের বাসা।

ভূরিভোজী ছানাগুলোকে খাওয়াবার জন্যে ওরা
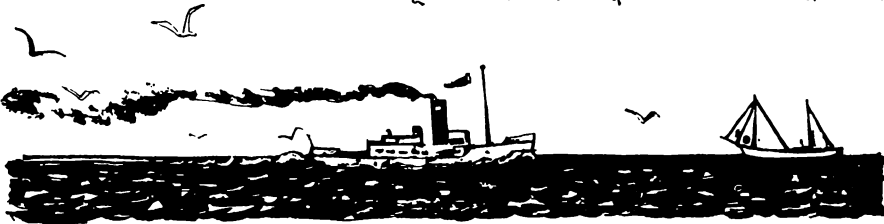
ডেকে মাছি এবং অন্যান্য কীট-পতঙ্গ ধরত। বাতাসে ডেক থেকে মাছি উড়িয়ে নিয়ে গেলে ওরাও খোলা সমুদ্রে উড়ে গিয়ে শিকার ধরে ফের ফিরে আসত তাদের ভাসমান বাসায়।

কী একটা অলিখিত চুক্তিতে জাহাজের সমস্ত লোকই সযত্নে আগলিয়ে রাখত তাদের পালকওয়ালা সহযাত্রীদের।

...ডাঙা দেখা যেতেই দুটো পাখিই উড়ে গেল তীরে। অনেক পরে তারা ফিরে এল ঠোঁট ভর্তি ছোটো ছোটো কীট নিয়ে।

চিফ-চ্যাফের এ আচরণ যেন বা অভিজ্ঞতার বিপরীত, কেননা তাদের বাসা মাত্র কয়েক মিটার সরিয়ে রাখলেই তারা আর তা খুঁজে পায় না। তবে এ ক্ষেত্রে জাহাজটা তাদের কাছে মনে হয়েছিল দ্বীপ বা অন্য কোনো প্রাকৃতিক আশ্রয়ের মতো, তাতে বাসাটা কোথাও সরে যায় নি, ডেকের অন্যান্য জিনিসপত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে বরাবরই ছিল একই জায়গায়।
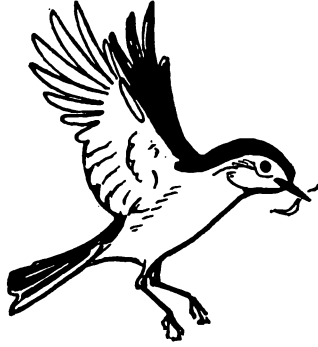
পতঙ্গের একটা বৈশিষ্ট্য

পয়লা মে'র রোদ ভরা সকালে সবার সঙ্গে আমিও নেমেছি রাস্তায়। উৎসবের মিছিলে তা ভরে উঠেছে অনেক আগেই। জনস্রোত কূল ছাপিয়ে ফুটপাথ, আঙিনা, সব ভাসিয়ে দিচ্ছে।

আমাদের সারিটা থেমে গেল। উঁচুতে গর্জন করে উঠল এরোপ্লেনের ইঞ্জিন। মাথার ওপর দিয়ে সারি বেঁধে উড়ে যাচ্ছিল ইস্পাতের পাখিরা, মাটিতে পিছলে যাচ্ছিল তাদের ক্ষিপ্র ছায়া। আকাশের দিকে তাকিয়ে একটা কালো বিন্দু চোখে পড়ল আমার। অনেক উঁচু থেকে তা নেমে আসতে লাগল সোজা আমার দিকে। দেখা গেল সেটা ভ্রমর। নির্ভুল লক্ষ্যে তা এসে বসল আমার বাট্‌ন্‌-হোলে গোঁজা এক স্তবক লিলি-অব-দ্যা-ভালি ফুলে।

আমার কাছেই ছিল একদল কিশোর জীববিদ। তাদের অবাক লাগল এই দেখে যে অত উঁচু থেকে ভ্রমরটা ছোট্ট একগুছি লিলির গন্ধ 'টের পেল' কেমন করে — জ্বলজ্বলে সাজগোজ করা শোভাযাত্রীদের সারির মধ্যে সে ফুল যে চোখেই পড়েই না, রোদে তপ্ত পিচ থেকে ওঠা হাজার হাজার গন্ধে তার সৌরভ যে একেবারেই অকিঞ্চিৎকর। কীট-পতঙ্গের ঘ্রাণশক্তি সম্পর্কে প্রশ্নে প্রশ্নে ওরা ছেঁকে ধরল আমায়। কিশোর বন্ধুদের জবাব দিতে আমার আরো কয়েকটা অভিজ্ঞতার কথা বললাম ওদের।

ছাত্রজীবনেই আমি একবার গুটি থেকে বিরল জাতের একটা নৈশ প্রজাপতি বার করি, লাতিনে তার নাম Orgia antigua। এদের মদ্দাদের পাখা বেশ সুবিকশিত, পাটকিলে রঙের ওপর শাদা শাদা ফুটকি, শুঁড়গুলো ঘন, চিরুনির মতো। মাদীদের শুঁড় কিন্তু সরু সরু, সুতোর মতো, তাছাড়া তাদের পাখা থাকে না। গুটি থেকে বার করে আমি আমার বন্দিনীকে রাখি গজ কাপড়ের একটা থলিতে। এই ধরনের প্রজাপতির দেখা মেলে কদাচিৎ, তাও কেবল বনে।

সন্ধ্যায় আমি থলিটা ঝুলিয়ে রাখি

বারান্দায়। দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেলাম যে মাঠ পেরিয়ে সারি বেঁধে মন্দা প্রজাপতিরা উড়ে আসছে থলিটার দিকে। আসছে তারা বন থেকে আর সে বন আমার বাসা থেকে এক কিলোমিটারের বেশি দূরে। বাতাসের উল্টো দিকে সোজা রেখায় এসে তারা থলিটায় ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করতে লাগল। যে 'ঘ্রাণশক্তিতে' প্রায় দেড় কিলোমিটার দূর থেকেও মন্দারা ছোট্ট বন্দিনীটির অস্তিত্ব টের পায়, তাতে স্তম্ভিত হবে না কে!
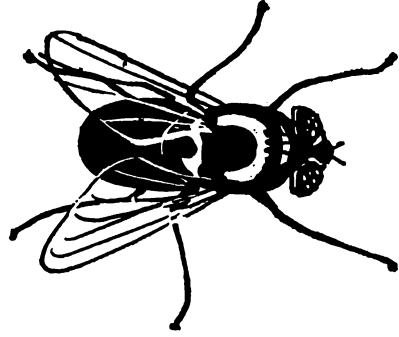
ফেলানি খাদ্যের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে মাছির ভন-ভনানি দেখতে আমরা অভ্যস্ত, কিন্তু মাছিগুলো তার শিকারের সন্ধান পায় কোত্থেকে তা নিয়ে বড়ো ভাবি না। জানলা দিয়ে নষ্ট হয়ে যাওয়া একটুকরো মাংস ছুড়ে দিলে দেখা যাবে শিগ্‌গিরই তা বড়ো বড়ো সোনালী মাছিতে ছেয়ে গেছে, যেন ঠিক এরই অপেক্ষায় ছিল। বহু মাছি আবার কয়েকটা পাড়া পেরিয়েও উড়ে আসে।

উত্তরী হরিণদের অবিরাম উৎপীড়ক গো-মাছিরা তাদের শিকারের সন্ধান পায় বিশ কিলোমিটারেরও বেশি দূর থেকে। আমরা এও দেখেছি যে পাখি মারা পড়ার দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যেই দূর থেকে উড়ে এসেছে গুবরেজাতীয় পোকা। পাখির মাংস পচতে শুরু করার আগেই 'মাংসভুক মাছি' আর গুবরেরা পাখির লাসের দিকে ধাওয়া করেছে। মরুভূমিতে কারাভান চলে যাবার পর বালিতে উটের গোবর পড়ে থাকলে তৎক্ষণাৎ কে জানে কোথা থেকে হঠাৎ উড়ে আসে বড়ো বড়ো গুবরে পোকা।

পতঙ্গদের এই আশ্চর্য ক্ষমতার কারণ তাদের স্নায়ুকোষ অসাধারণ সুবেদী, আর এ কোষ থাকে তাদের শুঁড়ে, পেয়ালাকৃতি গর্তের মধ্যে অনাবৃত।

মন্দা প্রজাপতি, কয়েক জাতের গুবরে ও অন্যান্য পতঙ্গের শুঁড়গুলো হয় চিরুনির মতো। এ রূপ গঠনের ফলে প্রত্যঙ্গটির উপরিভাগের সুবেদিতা বহুগুণ বেড়ে যায়। পতঙ্গদের কাছে বাতাস গন্ধ (এবং শুধুই কি গন্ধ?) বয়ে আনে মাঝে মাঝে কয়েক ডজন কিলোমিটার দূর থেকে। ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে,

বাতাসের উল্টো মুখে সরু একটা ফিতের আকারে উড়ে পতঙ্গেরা তাদের মাদী বা খাদ্যের সন্ধানে পাড়ি দিচ্ছে বিপুল দূরত্ব।

১৯৩৬ সালে গ্রীষ্মে চিড়িয়াখানার কিশোর জীববিদ গর্শ্কভ একতাল গোবর থেকে ধরে তিরিশটি নীলচে-সবুজ মাছি। তাদের ওপর ময়দা ছিটিয়ে গর্শ্কভ বিভিন্ন দূরত্ব থেকে পাঁচটি করে মাছি ছাড়তে থাকে। গোবরের তালটা তারা খুঁজে বার করে এমনকি সাত শ’ মিটার দূর থেকেও। খোঁচা খোঁচা রোঁয়ার মধ্যে গায়ে লেগে থাকা ময়দা দেখে গর্শ্কভ অনায়াসে সনাক্ত করে তাদের।

পরীক্ষায় দেখা গেছে, পতঙ্গের শুঁড়ে প্যারাফিনের পাতলা প্রলেপ লাগালে তারা জোরালো গন্ধ-ছাড়া খাদ্যও ধরতে পারে না।

প্রকৃতিবিদের চোখে

বক্তাটির পরনে হাফ-প্যাণ্ট, গলায় বাঁধা পাইওনিয়রদের লাল রুমাল। অল্পবয়সী শ্রোতারা তার প্রতিটি কথা গিলছিল সাগ্রহে...

এটা হল মস্কো চিড়িয়াখানার কিশোর জীববিদ চক্রের একটা হেমন্তী সভা। বিগত গ্রীষ্মে কী কী কাজ হয়েছে তার আলোচনা চলছিল। একের পর এক রিপোর্ট দিল তারা। প্রচুর চিত্তাকর্ষক পর্যবেক্ষণ চালিয়েছে কিশোর প্রকৃতিবিদেরা, মাথা-খাটানো পরীক্ষা করেছে অনেক।

সমাগতদের একটা মজার ঘটনা জানাল শুরা গর্শ্কভ। মিলন-কালে উই-ঢিপি থেকে তরুণ উইয়েরা উড়ে যাবার পর কীভাবে তাদের পাখা খসে যায়, সেটা পর্যবেক্ষণ করেছে সে। ডানাওয়ালা উইগুলোকে সে একটা বিশেষ আধারে মন দিয়ে লক্ষ্য করতে থাকে। দ্বিতীয় দিনেই তাদের মধ্যে সুস্পষ্ট অস্থিরতা দেখা গেল: মনে হল যেন ডানায় ওদের অসুবিধা হচ্ছে, ভয় পাচ্ছে। একের পর এক উইগুলো বেঁকে গিয়ে প্রথমে একটা ডানার গোড়া কামড়ে ছিঁড়ে ফেলল, তারপর দ্বিতীয় ডানাটা।

এইভাবে শুরা সিদ্ধান্ত করল যে উই নিজেই নিজের ডানা কেটে ফেলে, আগে যা ভাবা হত, সেভাবে পরস্পর কামড়ে নয়।

অন্য দুটি ছেলে — বোরিয়া ভাসিলিয়েভ আর ভলোদিয়া সীতিন গ্রীষ্মে লক্ষ্য করে উইরা কী শিকার নিয়ে যায় তাদের বাসায়। উইয়ের সারির কাছে বসে তারা উইদের সবকিছু শিকার কেড়ে নিয়ে বয়ামে রাখতে থাকে। এ থেকে কিশোর জীববিদরা এই সিদ্ধান্তে আসে যে উইয়েরা প্রধানত শিকার করে অনিষ্টকর কীট আর গেঁড়ি। উইয়েদের একটা সারিকে ওরা পর্যবেক্ষণ করে দুই ঘণ্টা ধরে। পর্যবেক্ষণাধীন উই-ঢিপিটার বাসিন্দারা দিনে কী পরিমাণ শিকার ধরে তা জানার জন্যে বোরিয়া আর ভলোদিয়াকে শুধু একটা সরল অংক কষতে হয়েছিল। একটা সারিতে দুই ঘণ্টার ভেতর যত খাদ্য তারা পেয়েছিল সেটাকে তারা পাঁচগুণ করে, কেননা উই-ঢিপি থেকে এ রকম সারি চলে গিয়েছিল পাঁচটা; তারপর সেটার আরো পাঁচগুণ, কেননা গ্রীষ্মের এ সময়টা উইদের কর্মদিনের দৈর্ঘ্য দশ ঘণ্টা।

মস্কো অঞ্চলের পদুশ্কিনো গ্রামে ইউরা সকোলভ একটা প্রাচীন স্তূপে খোঁড়া ব্যাজারের গর্ত খুঁজে পায়। এখানে শুধু প্রকৃতি-বৈজ্ঞানিক নয়, প্রত্নতাত্ত্বিক সন্ধানও

চালানো যেত: গর্ত খোঁড়ার সময় ব্যাজাররা মাটির সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন কালের ছোটোখাটো ব্যবহার্য জিনিসও বার করে দিত।

গ্রীষ্মে বোরিয়া গার্‌কাভি যায় ক্রিমিয়ার সংরক্ষিত জীবাঞ্চলে, একজাতের রো হরিণ পর্যবেক্ষণ করে। সে বললে, লোক দেখলে ওরা ঝোপের ভেতর থেকে কর্কশ গলায় ডাকতে শুরু করে। বোরিয়া বোঝাল যে শত্রু বা যাকে তারা শত্রু বলে ভাবছে তার আচমকা আবির্ভাবে এই জাতের সব হরিণই তাই করে। ডাকে এরা খুবই জোরে।

উই সম্পর্কে আরো একটা চিত্তাকর্ষক রিপোর্ট দিলে ভলোদিয়া সীতিন। গ্রীষ্মে ছোটো ছোটো কালো একজাতের উইয়ের দিকে তার নজর যায়, এরা তাদের বাগান-বাড়িতে এসে চিনি-টিনি, নানা খাবার খেত।

‘এদের বাসাটা আবিষ্কার করলাম বাগান-বাড়ি থেকে সামান্য দূরে,’ বললে ভলোদিয়া। ‘সেখান থেকে তাদের লম্বা একটা সারি চলে এসেছিল বাড়ি পর্যন্ত। বাসায় কেরোসিন ঢেলে দিই। সেই থেকে বাড়িতে আর উই দেখা দেয় নি, তবে তাদের জায়গা নেয় পিসু। দিন দিনই তাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে।’

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, আগে যে পিসু দেখা যায় নি, তার কারণ কি এই নয় যে কাঠের তক্তার ফাঁকে ফাঁকে বাসা নেওয়া এইসব পরজীবীদের শূক খেয়ে ফেলত উইয়েরা?

ভানিয়া দানিলভ আকৃষ্ট হয় পেঁচায়। তার পর্যবেক্ষণ থেকে সে সুনিশ্চিত যে পেঁচার ছানারা ভয়ানক পেটুক। ও বললে:

'দীর্ঘকর্ণ পেঁচাদের আমি লক্ষ্য করি, তারা তাদের তিনটি বাচ্চার জন্যে রোজ নিয়ে আসত পঁচিশটা করে নেংটি ইঁদুর, কিন্তু তাতেও তাদের মন উঠত না।'

শুখার সময় প্রাণীরা কী করে, এই নিয়ে ছিল কিশোর জীববিদ ইউরা স্তেইকের আগ্রহ। বিশেষ করে সে লক্ষ্য করেছে যে মক্ষিকাপালকেরা যদি মৌমাছিদের জন্যে বিশেষ জলের ব্যবস্থা না করে, তাহলে তারা কিছুতেই কাছের জলাশয় ছেড়ে আসতে চায় না, যদিও সবুজ ব্যাঙেরা তাদের খেয়ে ফেলে। গোল্ড ফিঞ্চ, কাক প্রভৃতি পাখি শুখার সময় নদী ছেড়ে যায় খুবই অনিচ্ছায়। জল ছেড়ে যেতে চায় না বলে তারা তখন মানুষকে তাদের খুবই কাছাকাছি আসতে দেয়...

অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক কিশোর জীববিদের এই হল গ্রীষ্মকালীন কাজের খতিয়ান। এ থেকে বোঝা যায় যে আমাদের ছেলেদের পর্যবেক্ষণ-শক্তি বেশ আছে, এমন সব চিত্তাকর্ষক পরীক্ষা চালাতে পারে তারা, যা থেকে প্রায়ই গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত টানা সম্ভব।

আস্কানিয়া-নোভা'তে

(ভ্রমণ-বৃত্তান্ত)

ইউক্রেনের সীমাহীন স্তেপের মধ্যে সুবিস্তৃত সংরক্ষিত অঞ্চল আস্কানিয়া-নোভা। প্রথম সেখানে যাবার সুযোগ হয় ১৯৩৪ সালে। বিরাট একটা পার্ক সেখানে ঘন হয়ে বেড়ে উঠেছে। সেচ চালানো জমি, উর্বরতা তার অতুলনীয়। গাছ-পালা, ঝোপঝাড়, ঘাসের বাড় এখানে ফলাও আর ঝটপট।

আস্কানিয়া-নোভা হল বিশাল এক প্রাকৃতিক ও কৃষি ল্যাবরেটরি। শুধু এখানে পরীক্ষা চলে শাদা ইঁদুর বা খরগোসের ওপর নয়, বুনো ষাঁড়-বাইসন, বুনো ঘোড়া, কৃষ্ণসার মৃগ, উটপাখি, হরিণ, বড়ো বড়ো শৃঙ্গী প্রাণী, ভেড়া, শুয়োর ইত্যাদি নিয়ে। পরীক্ষাধীন পশুদের এখানে খাঁচায় পোরা হয় নি, অবাধে তারা ঘুরে বেড়াত পার্কে, আস্কানিয়া সংরক্ষিত অঞ্চলের বিস্তীর্ণ তৃণভূমির আদিম মাটিতে, সেই সঙ্গে অতি সুপ্রসর কতকগুলো খোঁয়াড়েও। ঘন ঝোপঝাড়ে ঢাকা পুকুরে ছিল নানা ধরনের জলচর পাখি। তৃণভূমিতে অসংখ্য সুস্লিক, খরগোস, শেয়াল। পার্কে নির্বিবাদে বেড়াত ফেজণ্ট, ঝোপের পালা খেত হরিণে।

কিন্তু এখানে শুধু বিদ্যমান প্রাণীদেরই পর্যবেক্ষণ করা হত তাই নয়, আরো উন্নত জাতের নতুন নতুন পশুও গড়া হত। যেমন, ইংলণ্ডের শাদা শুয়োর আর স্থানীয় স্তেপের শুয়োর থেকে পাওয়া যায় অদৃষ্টপূর্ব একটা জাত — ইউক্রেনীয় শাদা শুয়োর। স্তেপের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে এই দোআঁশলারা উত্তরাধিকার

পায় নম্রতা, গতিশীলতা, আর অপেক্ষাকৃত নরম, লম্বা লম্বা ঘন কুচি, তীব্র বাতাস থেকে তা তাদের বাঁচাত। অন্য দিকে ইংলণ্ডের পূর্বপুরুষরা তাদের দেয় সুপরিশীলিত আকার, ফলে তাদের ওজন অনেক বেড়ে যায়। মনে চমৎকার ছাপ ফেলেছিল স্তেপের লাল গরুর সঙ্গে ঝুঁটিওয়ালা আরবী ষাঁড়ের সংকর। ভারতীয় বুনো ষাঁড়ের সঙ্গে ধূসর ইউক্রেনীয় গাইয়ের মিলনে যে কালো কালো বাছুর হয়েছিল তা ভারি সুন্দর। গরুদের সুপ্রসর পরিচ্ছন্ন আঙিনায় আপনা থেকেই নজর যায় ধূসর ইউক্রেনীয় গাইয়ের সঙ্গে চমরী ষাঁড়, ইয়াস্তেঙ্গের সঙ্গে ঝুঁটিওয়ালা ষাঁড়ের জটিল সংকর। খোলা স্তেপে চরছে চমৎকার সব ঘোড়া, সুগঠিত তার গ্রীবা — ইংলণ্ডের দৌড়বাজ ঘোড়ার সঙ্গে বুনো ঘোড়ার মিলনের ফল।

আস্কানিয়া-নোভা থেকে ৯০ কিলোমিটার দূরে নীপারের কাছাকাছি দ্বীপময় বনের মধ্যে, আস্কানিয়ার একটি বিভাগ বুর্‌কুতী'তে ছিল বহু বুনো ষাঁড়-বাইসন, সাইবেরীয় মারাল হরিণ, শান্ত ফুটকিদার হরিণ। হরিণ আর বাইসনদের সেখানে তাড়িয়ে আনা হয় আস্কানিয়া থেকে। পাঁচ দিনে তারা পাড়ি দেয় প্রায় ১০০ কিলোমিটার। প্রথমটা তারা বাধ্যের মতো তাদের রাখালদের কথা শোনে, কিন্তু অজানা জায়গায় এসে পড়তেই চঞ্চল হয়ে ওঠে তারা, ঘুরে গিয়ে গোটা পাল ফের এসে পৌঁছয় আস্কানিয়ায়। শুধু রাখালদের অসাধারণ নৈপুণ্যেই পালটাকে থামিয়ে বুর্‌কুতী'র পথ ধরা সম্ভব হয়। শুধু একটা ফুটকিদার হরিণ নির্দিষ্ট জায়গায় আসার পর রাখালের অবাধ্য হয়ে ওঠে: সোজা আস্কানিয়ার অভিমুখে লাফাতে লাফাতে ছুটে যায় আর পাঁচ ঘণ্টার দৌড়েই সুচারু জীবটি এসে থামে পার্কের বেড়ার কাছে।

বুর্‌কুতী'র একজন রাখাল আমায় বলছিল, 'হরিণ সব কথা বোঝে।' ওদের সঙ্গে সে এমনভাবে কথা কইছিল যেন ওরা মানুষ, ওরাও সাধারণ গৃহপালিত পশুর মতোই শান্তভাবে মাঠে চরছিল। আমার সঙ্গে আলাপের মাঝখানে লোকটা হঠাৎ হাঁক দিয়ে উঠল একটা মাদী হরিণের উদ্দেশে, কেবলি সে পাল থেকে সরে পড়ার চেষ্টা করছিল:

'এ্যাই, যাচ্ছিস কোথায়?'

হরিণীই থেমে গিয়ে কান খাড়া করে রইল কিছুক্ষণ, তারপর বাধ্যের মতো ফিরে এল।

বুনো ষাঁড়-বাইসনদের যখন স্তেপ থেকে তাড়িয়ে আনা হচ্ছিল বিচ্ছিন্ন সব খোঁয়াড়ের দিকে, গোটা পালটা তখন হঠাৎ সরে গিয়ে ধুলোর মেঘ উড়িয়ে ছুটে গেল পাশ দিয়ে। ভীমকায় এই প্রাণীগুলো ক্ষ্যাপার মতো মাথা নাড়াতে লাগল, মাটি কেঁপে গুম গুম করে উঠল তাদের খুরের ঘায়ে। রাখালরা বোঝালে, আমাদের অস্তিত্বই নাকি ষাঁড-বাইসনদের এমন কাণ্ডের কারণ। নতুন লোক আসা মানেই বুনো ষাঁড়দের পক্ষে অপ্রীতিকর কয়েকটা ব্যাপার — বিশেষ সব স্ট্যাণ্ডে নিয়ে গিয়ে তাদের ওজন করবে, মাপবে, জ্বালাতন করবে।

রাখালদের তত্ত্বাবধানে ঝাঁকড়া-লোমো ষাঁড় আর সুঠাম হরিণগুলো নিশ্চিন্তে চরে বেড়াতে দেখে ভারি আশ্চর্য লাগে! আস্কানিয়ার মাঠে মানুষ সাফল্যের সঙ্গে তাদের গৃহপালিত করে তুলছে। শুধু উসুরির ফুটকিদার হরিণগুলোকে রাখালরা চেষ্টা করে হোগলা ঝোপ থেকে দূরে রাখতে: এসব হোগলা বনে ঢুকলে ভালোমতো পোষ মানানো জন্তুও হয়ে ওঠে বুনো, মনে করে যেন সে উসুরির হোগলা জংলাতেই রয়েছে।

বহুদিন থেকেই পার্কে আছে কাজাখস্তান, ককেশাস আর দূর প্রাচ্যের ফেজণ্ট। তাদের থেকে পাকাপোক্ত সংকর পাওয়া গেছে, 'মৃগয়া' বিখ্যাত তারা। অপরূপ এই পাখিগুলো পার্কে বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেছে। শুধু এক-আধটা কখনো-সখনো সাহস করে আস্কানিয়া ছেড়ে গিয়ে বাসা পাতে আজোভ সাগরের তীরে হোগলা জংলায়। আস্কানিয়ার উদ্ভিদ উদ্যানে এরা ভয় পেয়ে ডজনে ডজনে উড়ে যাচ্ছিল জুনিপার ঝোপে ঢাকা মাটি থেকে, মানুষকে কাছে আসতে দেখলে নিচু হয়ে ঘাসের সঙ্গে শিটিয়ে খুরখুরিয়ে পালাচ্ছিল ছুটে। অথচ আশ্চর্য, হাঁস-মুরগীদের খাবার দেবার সময় এই ভীরু-ভীরু বুনো ফেজণ্টগুলোই সেখানে পাশাপাশি খাবার খেতে থাকে, পাশেই যে মানুষ রয়েছে সেদিকে দৃক্‌পাতও করত না।

শরতে উত্তর থেকে উড়ে আসা হাজার হাজার পাখি অনেক দিন বিশ্রাম নেয় আস্কানিয়ার পার্কে। নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়েও সেখানে সোল্লাসে গান গেয়েছে কালোথ্রাশ পাখি। ফার গাছের মাঝে মিহি গলায় চিঁচিঁ করেছে আমাদের দেশের সবচেয়ে ছোট্ট পাখি — হলুদ-মাথা কিঙ্গলেট। শীত তেমন কড়া না হলে তাদের মাঝে মাঝে উত্তরী বনে দেখা যায় গোটা বছরই। তাই কিঙ্গলেটদের ধরা হত স্থিতু পাখি। সত্যি, সীমাহীন স্তেপ পেরিয়ে এই ক্ষুদে পাখিগুলো উড়ে যেতে পারে, তা কল্পনা করাই কঠিন।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে পারে! **১২ই** নভেম্বর পর্যন্ত পার্ক ছিল হলুদ-মাথা কিঙ্গলেটে ভর্তি। আর ঠিক পরের দিনই তারা একেবারে দলকে দল উধাও।

সিসকিন পাখিগুলোর বেলাতেও একই ব্যাপার। এই সকালেই দেখেছিলাম মস্তো একঝাঁক সিসকিন নিশ্চিন্তে অ্যালডার গাছের বীজ খুঁটছে, কিন্তু দুপুরে যেন কার হুকুম পেয়ে আকাশে উঠে একটা ঘন মেঘের আকারে রওনা দিলে দক্ষিণে।

আস্কানিয়া-নোভা'র সংরক্ষিত অঞ্চলে আছে কয়েক হাজার হেক্টর আদিম স্তেপভূমি। কখনো এখানে হাল পড়ে নি। ফেদার-গ্রাস, সোমরাজ, খরগোস, সুস্‌লিক, ভরত পাখি, স্তেপের ঈগল — সবই এখানে অনাহত। এমনকি ঘাসও এখানে কাটা হয় না, শিকার করা নিষিদ্ধ। শুধু কতকগুলো জায়গায় বানানো হয়েছে 'স্যানাটোরিয়ম', সেখানে রোগভোগের পর স্বাস্থ্য ফেরায় আফ্রিকান কৃষ্ণসার মৃগ, বুনো ঘোড়া প্রভৃতি জন্তুরা।

স্তেপের দূর দূর অঞ্চলে সুস্‌লিকদের গর্ত এত বেশি যে মনে হবে আর গোটা দশেক জীবও সেখানে আঁটবে না। এত ঘোঁষাঘেঁষি সত্ত্বেও বর্ষজীবী বন্য শস্য সেখানে বাড়ে আশ্চর্য ঘন হয়ে। রাখালরা বলে যে সুস্‌লিকরা তা যত খাবে, ততই গোছা বেঁধে তা বাড়বে।

স্তেপে খরগোস বেড়েছে আরো বেশি। মোটরে করে যাবার সময় আমরা কয়েক ডজন খরগোসকে পেছন থেকে তাড়া করি। সমতল এলাকায় গাড়ি যায় খরগোসদেরই সমতালে। সুতরাং খরগোসরা ছুটেছিল ঘণ্টায় ৪০—৪৫ কিলোমিটার বেগে। এটাই খরগোসের সাধারণ গতিবেগ, কিন্তু ড্রাইভার জানাল, ঘণ্টায় সত্তর কি আরো বেশি কিলোমিটার ছুটতে দেখা যায় খরগোসকে।

স্তেপে শেয়ালও অনেক, তারা প্রধানত শিকার করে মূষিকজাতীয় তীক্ষ্ণদন্ত প্রাণী, দ্রুতগতি খরগোস শিকারের চেয়ে এটা অবশ্যই অনেক সহজ। এখানকার শেয়ালের উপস্থিতিতে খরগোসরা এতই অভ্যস্ত যে কিছু কিছু খরগোস আদৌ তাদের আর ভয় করে না।

আমি দেখেছি, দুই খরগোস ঘাস খাচ্ছে আর, বড়ো জোর, চল্লিশ পা দূরে আলস্যে ঘুরঘুর করছে একটা শেয়াল। খরগোস-দুটো বেশ দেখতে পেয়েছিল, পেছনের পায়ে ভর দিয়ে তারা একটু উঁচু হয়ে বসল, কিন্তু পালাল না।

সংরক্ষিত স্তেপ থেকে খরগোসরা চলে যায় আশেপাশের এলাকায়। আস্কানিয়া-নোভা'র সংলগ্ন অসংরক্ষিত ভূমিতে বাসা নেয়া খরগোসদের শিকার করার অনুমতি আছে স্থানীয় শিকারী সংঘের — বছরে প্রায় পাঁচ হাজার।

অসাধারণ সে শিকার, তাতে যোগ দেবার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। আমাদের বনে, মাঠে যেভাবে শিকার করা হয়, তার সবই এখানে অন্য রকম। সূর্যোদয়ের সময় আমরা আস্কানিয়ার চৌহদ্দি ছাড়িয়ে আসি দুই কিলোমিটার এবং লম্বা সারিতে শুয়ে পড়ি চারণক্ষত স্তেপে। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য — কোনো রকম খেদানের দরকার হল না, ভোর হতেই স্তেপের সর্বত্র আপনা থেকেই ছুটতে শুরু করল খরগোস। গুলি শুরু করল শিকারী, আর তা এতই ঘন ঘন যে মনে হবে এটা শিকার নয়, যুদ্ধে শত্রুর আক্রমণ ঠেকানো হচ্ছে। আগে থেকেই শর্ত করা ছিল যে মাথা কিছু তিনটের বেশি খরগোস মারার অধিকার কোনো শিকারীর থাকবে না, কাজেই শিগ্‌গিরই শেষ হয়ে গেল শিকারের পালা। আমাদের সামনে দিয়েই ঝাঁকে ঝাঁকে পালাতে লাগল সন্ত্রস্ত খরগোসরা। প্রায়ই নজরের আওতায় তাদের দেখা যাচ্ছিল একশ কি শতাধিক।

...আস্কানিয়া আমি ছেড়ে যাই বিমানে। জোর বাতাস বইছিল, কেবিনে যখন বসলাম, বাতাসের ঝাপ্‌টায় কেঁপে কেঁপে উঠছিল বিমান। পাইলট গ্যাস বাড়ালে। ভয়ানক গোঁ-গোঁ করে উঠল প্রপেলার। ঠিক মোটরগাড়ির মতো আমরা খোলা স্তেপ দিয়ে ছুটে গেলাম, তারপর ঘুরে বাতাসের উল্টোমুখে গতি নিতেই তবে বিমান মাটি ছাড়ল।

খুব নিচু দিয়ে উড়ছিল বিমান। দেখলাম, সোমরাজ ঝোপ থেকে নানান দিকে ছুটে যাচ্ছে খরগোস, আঁতকে উঠে ছুটোছুটি করে মরছে সুস্‌লিক, নিজেদের বিবর আর খুঁজে পাচ্ছে না। তখন হেমন্ত, সুস্‌লিকরা সাধারণত তখন থাকে ঘুমন্ত অবস্থায়। বোঝা যায়, হঠাৎ হিম পড়ে ওদের অগভীর গর্তে সেঁধিয়ে জাগিয়ে দিয়েছে তাদের। প্রথমে যতই আশ্চর্য লাগুক, ব্যাপারটা সত্যিই তাই। এরা যখন ঘুমন্ত অবস্থায় পেঁছিয়, তখন এদের গায়ের তাপমাত্রা থাকে প্রায় শূন্যাঙ্কে। কিন্তু বেশি ঠাণ্ডা পড়লে ওরা জমে না গিয়ে এত গরম হয়ে ওঠে যে নিদ্রাবস্থা টুটে যায়।

বিমানের জানলা দিয়ে দেখা গেল ভরত, ফিঞ্চ প্রভৃতি বিরাট একঝাঁক যাযাবর পাখি প্রায় মাটির কাছেই প্রচণ্ড ঝড়ের সঙ্গে লড়ছে। বিমানের অনেক নিচে উড়ছে

লোমশ-পদ বাজার্ড পাখিরা, সুদূর তুন্দ্রা থেকে ওরা এই স্তেপে উড়ে এসেছে মূষিকজাতীয় তীক্ষ্নদন্ত প্রাণী শিকারের জন্যে।

আজোভ সাগরের খাড়িগুলোর ওপর অল্প উ'চু দিয়ে যখন বিমান উড়ছিল, তখন সাগ্রহে তাকালাম জানলায়। তীরে জিরচ্ছে হাজার হাজার যাযাবর পাখি। ভালো করে নজর করলে রাজহাঁসও দেখা যাচ্ছিল, এরা ছিল জলজ উদ্ভিদগুলোর কাছাকাছি। ওপর থেকে স্বচ্ছ জলের ভেতর দিয়ে ঠাহর হচ্ছিল তলদেশের খ'ুটিনাটি আর বেশ বড়ো একঝাঁক মাছের চোখ-ধাঁধানো রুপোলী ঝলক।

আস্কানিয়া স্তেপের সীমানায় আমাদের নিচে ক্ষেতের মধ্যে ছুটোছুটি করছিল একটা শেয়াল, মুখ তুলে বহুক্ষণ সে চেয়ে রইল বিমানটার দিকে। এই হল আস্কানিয়া ভূমিতে আমাদের দেখা শেষ বাসিন্দা।

ওপরে উঠল বিমান। সেখান থেকে মাটি লক্ষ্য করা হয়ে উঠল কঠিন।

প্রকাশকের নিবেদন

আদরের কিশোর-কিশোরীরা!

প্রফেসর পিওতর মান্তেইফেলের ‘প্রকৃতিবিদের কাহিনী’ নামে এই যে-বইখানি তোমরা এক্ষুনি পড়ে শেষ করলে তা দিয়ে আমরা ‘রামধনু’ সিরিজ চালিয়ে যাচ্ছি।

বিশেষ করে বাঙলা ভাষার জন্যে প্রবর্তিত এই সিরিজে আগেই বেরিয়েছে:

‘বৃষ্টি আর নক্ষত্র’ — কোনোটা মজার, কোনোটা গুরুত্বপূর্ণ নানা নতুন গল্পের সংকলন। লিখেছেন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন জাতির লেখকেরা।

‘স্ফুলিঙ্গ থেকে অগ্নিশিখা’ — ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনকে নিয়ে কাহিনীর বই (প্রামাণ্য ফোটোগ্রাফ সহ)।

‘যাদু তীর’ — লিখেছেন প্রবীণা শিশু-সাহিত্যিকা ল্যুবোভ ভরোণ্কভা। এতে আছে চিত্তাকর্ষক একটি কাহিনী ‘যাদু তীর’ আর যুদ্ধের সময় মা-বাপ হারানো একটি খুকি কীভাবে আশ্রয় ও আত্মীয়তা খুঁজে পেল এক চাষীর সংসারে, তাই নিয়ে বড়ো গল্প ‘শহরের মেয়ে’।

‘ভয়ংকর রোমহর্ষক ঘটনা’ — লেখক আনাতোলি আলেক্সিন, বহু অ্যাডভেঞ্চারে পড়েছে এ বইয়ের নায়কেরা।

‘পৃথিবী দেখছি’ — বিশ্বের প্রথম ব্যোমনাবিক, সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর ইউরি গাগারিনের লেখা (প্রামাণ্য ফেটোগ্রাফ সহ)।

রুশ সাহিত্যের চিরায়ত লেখক **ইভান তুর্গেনেভের ‘মুমু’, আন্তন চেখভের ‘কাশ্‌তান্‌কা’** এবং আরো অনেক বই।

এসব বই তোমাদের আর তোমাদের গুরুজনদের কেমন লাগল জানতে পেলে প্রকাশালয় খুশি হবে।